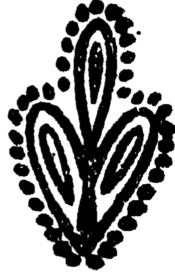


বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস,

৯৯।১এল, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দেড় টাকা = এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

রণু, খুকু ও বুকুনের
করকমলে

সূচী



গল্প লেখা হ'ল না

—১—

—হ্যালো ?

—আমি নবেন্দু।

—কেমন আছ নবেন্দু ? অনেক দিন খোঁজ-খবর নেই।

—খোঁজ-খবর আর কেমন করে নেব, বলুন ? বড্ড বিপদে পড়েছি।

—বল কি ! কী বিপদ ?

—বিপদ সাঙ্ঘাতিক। "মুক্তধারার" সম্পাদক বার বার তাগিদ দিচ্ছেন, পূজা-সংখ্যার জন্যে একটা গল্প চাই। পুজো এসে গেল। গল্পটাও মাথায় এসে আছে। কিন্তু বসে লিখবার মত একটা ঘর পাচ্ছিনে।

হেসে বললাম, কেন, তোমাদের বাড়ির ঘরগুলো সব কোথায় গেল ?

নবেন্দু একটু থেমে চাপা গলায় বলল, বাড়িতে বড় দিদি রয়েছেন যে।

সত্যিই তো। এ খেয়াল আমার আগেই হওয়া উচিত ছিল।

নবেন্দুর বিপদটা বুঝতে হলে তার বড়দিদির একটু পরিচয় দরকার।

অল্প বয়সে বিধবা হয়ে তিনি যখন বাপের বাড়ি ফিরে এলেন, তার কিছুদিন পরেই ওঁদের মা মারা যান। নবেন্দু তখন শিশু। বড়দিদিই তাকে মানুষ করে তোলেন। মরবার সময় মা বলে গিয়েছিলেন, 'ছেলেটাকে তোরই হাতে দিয়ে গেলাম, মা। ওকে কোনোদিন চোখের আড়াল করিসনে।' মায়ের এই শেষ কথাটি বড়দিদি অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছেন। নবেন্দু যতদিন ছোট ছিল, ততদিন তো কথাই নেই। আজ সে বড় হয়েছে। দুদিন বাদে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এখনও ভোরে উঠে মুখ ধোওয়া থেকে শুরু করে রাত নটায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত কাজ বড়দিদির চোখের সামনে করতে হয়। খেতে বসে এটা ওটা ফেলে রাখবার উপায় নেই। সামনে বসে বড়দিদি। ভাল ভাল স্বাস্থ্যের বই পড়ে আর বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ভাইয়ের জন্যে একটা "আদর্শ খাদ্য-তালিকা" তৈরি করেছেন। এতটা প্রোটিন, এতটা ফ্যাট্ আর এতটা ভিটামিন তাকে রীতিমত অঙ্ক কষে খাওয়ানো হয়। কতক্ষণ সে বাইরে

থাকবে, তারও সময় একেবারে বাঁধা। কলেজ থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলেই বড়দিদি প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করেন। আর বেড়াবার সময় দশ মিনিট পেরিয়ে গেলেই, সরকার মশাইকে ছুটতে হয় থানায়।

নবেন্দুর আবার একটু লিখবার অভ্যাস আছে। তার জন্যে নিরিবিলি বসে দুদণ্ড ভাবা দরকার। কিন্তু ভাবতে বসলেই বড়দিদি ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বারে বারে এসে গায় মাথায় হাত দিয়ে দেখেন, একটু বেশী দেরি হলেই নবীন ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। শরীর খারাপ বলে একা থাকতে চাইলে তিনি কিছুতেই পাশ থেকে ওঠেন না। মন ভাল নেই বললে অমনি পুরুত ঠাকুর এসে ভাগবত শোনান কিংবা ওস্তাদজী শোনান ধ্রুপদ।

কাজেই, "মুক্তধারার" সম্পাদক যে নবেন্দুকে সত্যিই বিপদে ফেলেছেন তাতে আর সন্দেহ কি?

দিন পাঁচ-ছয় পরে নবেন্দুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। একগাল হেসে এগিয়ে এল। বললাম, কি খবর, বড্ড খুশী যে?

—বেজায় সুখবর, দাদা। বড়দি যাচ্ছে কাল।

—অ্যাঁ! কোথায় যাচ্ছেন?

—তাঁর কোন্ ভাসুরপো, না কার অসুখ। একদিনের জন্যে ভবানীপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।

—বেশ! বেশ! গল্পটা লিখছ তাহলে?

—আশা তো করি!—বলে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

পর দিন ভোরে উঠেই বড়দিদি নবেন্দুকে ডেকে তুললেন।

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। সাবধানে থাকিস, আর বাইরে টো টো করে ঘুরিসনে। নবেন্দু যেন আকাশ থেকে পড়ল—তুমি ক্ষেপেছ! এই আমি এক্ষুনি শুয়ে পড়ছি। তুমি ফিরলে তবে উঠব।

বড়দিদি গালে হাত দিয়ে বললেন, ও মা! সে কি কথা? সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাবি?

নবেন্দু খানিক ভেবে বলল, বেশ; তাহলে বসে থাকব।

—না, না, না। চুপ করে বসে থাকলেই আবার ভাবতে শুরু করবি।

—তবে বসব না। পায়চারি করে বেড়াব।

—নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। সারাদিন পায়চারি করলে পা ব্যথা করবে না?

নবেন্দু চিন্তিতভাবে বলল, তা বটে। তাহলে কি করব? বড়দিদি ভরসা দিয়ে বললেন, তোকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই করব।

নবেন্দু যেন ভয়ানক ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমনি ভাবে মুখ ধুতে চলে গেল। বড়দিদি তার বোনেদের কাছে কতগুলো ফোন্ করলেন। তারপর বাড়ির যত ঠাকুর চাকর ঝি দারোয়ান সরকার ড্রাইভার—সব্বাইকে ডেকে ভাইয়ের সম্বন্ধে নানা রকম নির্দেশ দিয়ে তাঁর ভাসুরপোকে দেখতে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দুর ঘরেও কপাট পড়ল।

একটা জমকালো গল্প কদিন থেকে তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সাধারণ ধরনের ঘরোয়া প্লট নয়, ছোট-খাটো হাসি

রহস্য কিংবা করুণ-রসের কাহিনীও নয়, একেবারে ভীষণ জোরালো লোমহর্ষণ অ্যাড্‌ভেঞ্চার—

······বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ারের ছেলে সুরজিৎ তার থার্ড ক্লাসের বোন মীরাকে নিয়ে এরোপ্লেনে আফ্রিকা পাড়ি দিচ্ছে। একেবারে নন্‌-স্টপ ফ্লাইট! পথে ঘটবে বিপদ। এরোপ্লেনের ডানা ভেঙে পড়বে গিয়ে তারা নায়েগ্রার ধারে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে দেখা দেবে সিংহ, ভালুক, গরিলা আর মানুষখেকো বুনো মানুষের দল। মীরাকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাবে দেবীর আসনে, আর তারই সামনে বলি দেবার আয়োজন হবে নবেন্দুর। ·তারপর ·····

নবেন্দুর গল্প শুরু হল। এগিয়ে চলল পাতার পর পাতা। কলম ছুটল তীরবেগে। কিন্তু আরব সাগর পাড়ি দিয়ে সুয়েজে পৌঁছবার আগেই তার ঘরের দরজার কড়াটা কড়কড় করে নড়ে উঠল। বিরক্ত মুখে খুলে দিতেই পুরানো চাকর রামঠনাঠন সেলাম করে বলল, গোছল কা টাইম হো গিয়া—

তোমারা মাথা হো গিয়া—বলে নবেন্দু দুম করে দরজাটা তার মুখের উপরেই বন্ধ করে দিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। গল্পের নায়ক সুরজিৎ আর তার বোন মীরা তখন মিশরের মরুভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দিগন্তজোড়া অনন্ত বালুরাশি। তার উপর আগুন ছড়িয়ে চলেছেন আফ্রিকার মধ্যাহ্ন সূর্য।······

কলমের গোড়াটা কামড়ে ধরে নবেন্দু এক মুহূর্ত ভেবে নিচ্ছে কেমন করে রূপ দিলে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার পাঠকের মনে

আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবে। হঠাৎ দরজার শিকলটা ঝন্‌-ঝন করে বেজে উঠল। নবেন্দু টেবিলে বসেই চিৎকার করে উঠল—কে ?

—মু নটবর ঠকুর অছি। তমর ভাত দেউছি।

—রাজা করেছ ! যাও। ভাত খাবার সময় নেই আমার।

বেলা বেড়ে চলেছে। মাথায় জল নেই, পেটে খাবার নেই। নবেন্দু পাগলের মত কলম চালিয়েছে······

উল্কার মত ছুটে চলেছে সুরজিতের এরোপ্লেন, বনজঙ্গল পাহাড় নদী পেরিয়ে। তার গতির নেশার ছোঁয়াচ লেগেছে লেখকের মনে। বাইরের জগৎ ডুবে গেছে অন্ধকারে। ঠিক এমনি সময় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল টেলিফোন। নবেন্দুর কলমও যেন ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল। রুক্ষ-গলায় সাড়া দিল—হ্যালো ?

—আমি মেজদি বলছি।

—কী জন্যে জ্বালাচ্ছ এই দুপুর বেলা ?

—তুই কেমন আছিস ?

—খুব খারাপ।

মেজদি আর কিছু বলবার আগেই নবেন্দু রিসিভার রেখে দিল।

গল্পের বেগ এবার একটু মন্দা হয়ে এসেছে। সুরজিৎ আর মীরা উড়ে চলেছে নীলনদের উপর দিয়ে। মাথার উপর সীমাহীন নীল আকাশ, পায়ের নীচে তরঙ্গায়িত নীল জল। ওদের মনে পড়ছে দেশ, পিছনে-ফেলে-আসা জন্মভূমি। মনে পড়ছে আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবের বিদায় বেলাকার মুখ।

নবেন্দুর মনেও জেগে উঠল সেই করুণ ছবি। হঠাৎ তার সমস্ত স্বপ্ন-জাল ছিঁড়ে দিয়ে টেবিলের উপর বেজে উঠল—ক্রীং ক্রীং, ক্রীং ক্রীং……। নবেন্দু এক ঝটকায় তুলে নিল রিসিভার। গর্জন করে উঠল, কে আপনি ?

—কে, নবেন্দু ?

—হ্যাঁ, আমি।

—আমি তোর সেজদি।

—কি চাই তোমার ?

—চটছিস কেন ? কি হয়েছে তোর ?

—হয়েছে কলেরা, বসন্ত আর টাইফয়েড।

ঘটাং করে টেলিফোন রেখে দিয়ে সে ঘরের কোণে ইজি চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। গল্প লেখার মত উৎসাহ তখন আর একটুও নেই।

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করে দুটো বেজে গেল। নবেন্দুর মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। কিন্তু আর তো সময় নেই। সন্ধ্যা না হতেই বড়দিদি ফিরে আসবেন। তার আগে যেমন করেই হোক গল্পটা শেষ করতেই হবে। ক্লান্ত শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে নিয়ে সে আবার বসল গিয়ে লিখবার টেবিলে। লেখা চলল, এক লাইন, দু লাইন, তিন লাইন। ব্যস। আবার ডেকে উঠল সেই হতভাগা যন্ত্রটা। সেই একঘেয়ে ক্রীং ক্রীং। নবেন্দুর ইচ্ছে হল এক লাথি মেরে ওটার ভবলীলা শেষ করে দেয়। কিন্তু ততটা জোরও তার গায়ে ছিল না। কোনো রকমে চোঙটায় মুখ দিয়ে সাড়া দিল—হ্যালো ?

জবাব এল, আমি বীণা।

—ছোড়দি ?

—হ্যাঁ।

—আমি কেমন আছি, জানতে চাও ?

—হ্যাঁ ; ভালো আছিস তো ?

—মরতে বসেছি, বুঝলে ? মরতে বসেছি।

লাইনের ওপার থেকে একটা আঁতকে ওঠার শব্দ শোনা গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নবেন্দু সোজা গিয়ে দরজা খুলল। ঠিক সামনেই সিনেমা-যাত্রীর মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন—সরকার মশাই, নটবর ঠাকুর, রামঠনাঠন, দারোয়ান মহাবীর পাঁড়ে আর ড্রাইভার উজাগর সিং।

নবেন্দুর মাথায় খুন চেপে গেল। পাশে ছিল একটা আলনা। সেটাকেই তুলে নিয়ে গর্জে উঠল—কী দেখছ তোমরা ! বেরিয়ে যাও—নিকাল যাও।

দু-মিনিটের মধ্যে ভোজবাজির মত বারান্দাটা ফাঁকা হয়ে গেল। নবেন্দুর মনে হল, এ বাড়ির চেয়ে জেলও তার ভাল। এই খবরদারির অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না। দেরাজ খুলে কয়েকটা টাকা আর আলনা থেকে একটা শার্ট টেনে নিয়ে সে নীচে নেমে গেল এবং গেটের সামনে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে চেপে বসল।

সরকার মশাই তার দলবল নিয়ে কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। মনিবকে উধাও হতে দেখে বেরিয়ে এসে

দিলেন এক হাঁক। সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল একযোগে লাগিয়ে দিল হল্লা। পাশের বাড়ির লোকেরা মনে করল, চোর পালাচ্ছে। তারা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে এল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে যে ব্যাপারটা চলল, তাকে বলা যেতে পারে গলার জোরের কম্‌পিটিশন। সবাই চেঁচাচ্ছে; কেউ শুনছে না। মিনিট দশেক! তারপর হঠাৎ সব চুপ। ব্যাপার কি? সবাই অবাক হয়ে দেখল, তিনখানা জমকালো চেহারার মোটর গাড়ি গম্ভীরভাবে ফটকে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে একে একে নামলেন—মেজদি, সেজদি. আর ছোড়দি, তাদের গুটি পনেরো ছেলেমেয়ে আর গুটি আষ্টেক ঝি-চাকর। কাউকে কোনো কথা না বলে এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে তারা একটা প্রসেশন করে উপরে উঠে গেলেন।

—২—

ট্যাক্‌সিওয়ালা জানতে চাইল—কীধার যানে হোগা। নবেন্দু বলল—চল যেখানে খুশী। শিখ-বাবাজীর দাড়ির জঙ্গলে একটুখানি হাসির ঝিলিক দেখা দিল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বলল, উতার যাইয়ে। অগত্যা নবেন্দুকে নামতে হল। সামনেই তিন নম্বর প্লাটফরমে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। একখানা যে-কোনো স্টেশনের টিকেট কিনে ঢুকে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও দিল ছেড়ে। বর্ধমানে নেমে সে প্রথম হাঁপ ছাড়ল। ভরসা হল, এতক্ষণে বড়দিদির

হাতের বাইরে আসতে পেরেছে। আশ্রয় জুটল—মৃত্যুঞ্জয় কুশারীর "আদর্শ হিন্দু হোটেল"। তারই একটা নড়বড়ে তক্তপোশে শুয়ে হুটো রাত কেটে গেল।

তার পরদিন সকালে স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে পাতা উল্টোতেই চোখে পড়ল তার নিজের ছবি। তার ওপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপা—

৫০০৲ টাকা পুরস্কার!

ছবির নিচে রয়েছে বর্ণনা—ছেলেটি লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ছিপছিপে চেহারা, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি বছর, কপালের উপর কাটা দাগ আছে, নাম নবেন্দু মজুমদার। কবিতা এবং গল্প লিখিয়া থাকে। রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ দয়া করিয়া খোঁজ দিলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সকলের শেষে আছে—"নবু, লক্ষ্মী ভাইটি ফিরে আয়। বড়দি না খেয়ে আছেন। ঠিকানা জানালেই টাকা পাঠাব।—মেজদি।"

নবেন্দুর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। হোটেলে ফিরে দেখল ম্যানেজারের ঘরে জোর সভা বসেছে। ম্যানেজার আর তার তিন বন্ধু; সামনে ঐ দিনকার খবরের কাগজ। তাকে দেখেই সব হঠাৎ চুপ করে গেল। নবেন্দু কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল। কিন্তু চার জোড়া চোখ যে তাকে একেবারে গিলে খেতে চাইছে, সেটা তার চোখ এড়াল না।

পূজোর আর দিন পনের বাকী। এখনো হয়তো সময়

আছে। কোন রকমে কয়েকটা পাতা জুড়ে দিতে পারলে চলে যায় গল্পটা। খাতাটা তার পকেটেই ছিল। বের করে উলটে পালটে দেখছিল নবেন্দু। হঠাৎ দরজায় পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখল, ম্যানেজার আর তার তিন বন্ধু ঘরে ঢুকছেন।



নবেন্দুর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। ম্যানেজার একটা খাতা আর কলম বের করে বললেন, মশায়ের নামটা জানতে পারি ?

—কেন বলুন তো ?

—আজ্ঞে, ওটা আমাদের এই খাতায় টুকে রাখতে হয়।··· এই দেখুন না, হোটেলের সমস্ত বোর্ডারদের নাম-ধাম সব এখানে লেখা আছে।

নবেন্দু একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, আমার নাম বনমালী সামন্ত।

বনমালী সামন্ত!—চার বন্ধুতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একজন এগিয়ে এসে বলল, ওটা কি লিখছেন? কবিতা?

—আজ্ঞে, না। এ একটা গল্প।

—গল্প? বাঃ, দেখি কি রকম গল্প?

—না। এটা এখনো শেষ হয়নি। বলে খাতাটা মুড়ে নবেন্দু পকেটে পুরতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন। খাতা খুলতেই সকলের উপরে পাওয়া গেল গল্পের নাম এবং তার নীচেই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা—শ্রীনবেন্দু মজুমদার।

চার বন্ধুতে বেশ একচোট হেসে নেবার পর ম্যানেজার বললেন, আপনি তো আচ্ছা লোক, মশাই। দিদিরা রইলেন না খেয়ে আর ভাইটি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে দিব্যি দুবেলা হোটেলের অন্ন সাবাড় করছেন। রাগ বটে একখানা!

আরেক বন্ধু বললেন, যাক্। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়ুন। চল, আমরাও তৈরি হয়ে নিই। ঘণ্টাখানেক বাদেই একটা লোক্যাল আছে। ওতেই সাঁ করে চলে যাওয়া যাক।

নবেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, যেতে হয়, আমি একাই যেতে পারি। আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

ম্যানেজার বললেন, সে কি মশাই? বিজ্ঞাপনটা এখনো দেখেন নি নাকি? নগদ পাঁচশ টাকা! ভাগে কত পড়ল হে? ছাখ তো হিসেব করে।

ওদের একজন বলে উঠল—এর আর দেখাদেখি কি? পুরোপুরি একশ পঁচিশ।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। নবেন্দুর বাড়ির ফটকে একখানা প্রকাণ্ড ট্যাক্‌সি এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামলেন আদর্শ হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার, তার পেছনে একে একে তার তিন বন্ধু, আর সবার শেষে মাথা নীচু করে নবেন্দু।

সরকার মশাই ছুটে এলেন। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। পুরানো চাকর রামঠনাঠন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। খবর পেয়ে দিদিরা নেমে এলেন এবং নবেন্দুকে ধরে একেবারে বড়দিদির ঘরে নিয়ে তুললেন। তাঁর উঠবার শক্তি নেই। কি একটা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ম্যানেজার অ্যাণ্ড কোম্পানী নগদ পাঁচশ টাকা পকেটস্থ এবং পুরো পাঁচ সের লুচিমণ্ডা উদরস্থ করে বিদায় নিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বড়দিদির ঘর থেকে যখন ছুটি পাওয়া গেল, নবেন্দু নিজের ঘরে গিয়ে দেখল তার নামে একটা চিঠি পড়ে আছে। "মুক্তধারার" সম্পাদক শেষ তাগিদ দিয়েছেন।

চিঠি পড়া শেষ হতেই ঝি এসে জানাল বড়দিদি ডাকছেন। অ্যাডভেঞ্চারের আধখানা গল্প তখনো তার পকেটে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর একটা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লিখল,—সম্পাদক মশাই, মাপ করবেন। গল্প লেখা হল না। কেন হল না, সেকথা আপনি বুঝবেন না। আপনার তো আর বড়দিদি নেই।



পেন্‌শন নেবার পর থেকে বৈকুণ্ঠবাবু রোজ সকলে তিন ঘণ্টা করে খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। উখরুলে জাপানীরা কতটা হটল, নরম্যাণ্ডীতে আইসেনহাওয়ার ক মাইল এগুলেন,—এসব জমকালো খবর তো আছেই ; তাছাড়া মুন্সীগঞ্জের ডাকাতি, নোয়াখালির চালের দর, কর্মখালি, হারানো—প্রাপ্তি—নিরুদ্দেশ মায় কেশতৈলের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত—কোনটাই বাদ দেন না। সে দিন শুক্রবার। বৈকুণ্ঠবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে "কলিকাতা গেজেটের" পাতাটা পড়ছিলেন। হঠাৎ গলা থেকে একটা আঁতকে ওঠার মত শব্দ হল। তার পরেই দিলেন এক হাঁক—ওগো, শুনছ? শীগ্‌গির দেখে যাও—ন্যাড়া আসছে, আমাদের ন্যাড়া।

গিন্নী ছিলেন রান্নাঘরে। মোচার ঘণ্টে খুন্তি চালাচ্ছিলেন। বিকট চিৎকার শুনে খুন্তি হাতেই ছুটলেন বাইরের ঘরে। বৈকুণ্ঠবাবু তখন রীতিমত লাফাচ্ছেন—দেখেছ, ন্যাড়া, ন্যাড়া।

গিন্নী দরজার দিকে এগিয়ে বললেন—কই, কই, কোথায়?

—আরে না, না, ওখানে নয়। এই কাগজে। গেজেট হয়েছে, বরিশালে আসছে বদলি হয়ে। এই ছাখ।

গিন্নী ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

ন্যাড়া, ওরফে বিজয় সেন পুলিশের ডি. এস্. পি. বৈকুণ্ঠ বাবুর সম্পর্কে নাতি, কিন্তু আসলে আপন নাতির বাড়া। চাকরি পেয়েছে বছর তিনেক। তারপর থেকে আর দেখাশুনা হয় নি। বিয়েও হয়ে গেল বছর ছুই আগে। তখনো এঁরা যেতে পারেন নি। তারপর বৈকুণ্ঠবাবুরা বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন বরিশালে; আর ওরাও বেড়াচ্ছে সাতঘাটের জল খেয়ে। চিঠিপত্র ছুদিক থেকেই বন্ধ। সেই ন্যাড়া আসছে বদলি হয়ে ওঁদের কাছে। সস্ত্রীক বৈকুণ্ঠবাবু যেন বৈকুণ্ঠ হাতে পেয়ে গেলেন।

গিন্নী বললেন—একটা চিঠি লিখে দাও। এইখানেই উঠুক। ছুচারদিন থেকে তারপর নিজের বাসায় যাবে'খন। বৈকুণ্ঠবাবু বল্লেন—আরে না, না। তা হলে আর মজাটা হল কোথায়? ওদের বাসাতেই উঠুক। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব।

তারপর একদিন খবর পাওয়া গেল, বিজয়বাবুরা এসেছেন, এবং জর্ডন কোয়ার্টাসে ডি. এস. পি.-র বাড়িতে উঠেছেন।

রবিবার দেখে বৈকুণ্ঠবাবু মস্ত বড় ভোজের আয়োজন করলেন। পোলাও, কালিয়া, এসব তো হলই; তাছাড়া যার নাম শুনলেই গোটা বরিশাল পাগল হয়ে যায়, সেই মহাবস্তু অর্থাৎ 'কাউঠ্যা'ও (কচ্ছপ) এসে গেল গোটা পাঁচ-ছয়। দশ জন বন্ধুবান্ধবকেও এই উপলক্ষে বলতে হল। তারপর, শুধু ভোজ দিলেই তো আর চলে না। নাতবৌএর মুখ দেখে কিছু দিতে হবে। গিন্নীর পছন্দমত একখানা দামী বেনারসী আর একটা জড়োয়া নেকলেস কেনা হল। বেরিয়ে গেল ৩৭৫৷৷/১০ আনা। এর কমে হবে কেন যুদ্ধের বাজারে? স্থির হল— গয়না কাপড় নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু নাতবৌএর মুখ দেখে ওদের দুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পুলিশের ডি. এস. পি। বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হল না। গেটের সামনেই ছিল এক সিপাই। বৈকুণ্ঠবাবু গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে জেনে নিলেন, হ্যাঁ; ডি. এস্. পি. বিজয় বাবুর কুঠিই বটে।

পুলিশ জানাল—সাব্ বাহার গিয়া।

বৈকুণ্ঠবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি?

—মাইজি উপরমে হ্যায়।

—আচ্ছা, তাহলে ওপরেই যাওয়া যাক্।

পুলিশ একটু ইতস্তত করলো, কিন্তু বাধা দিলে না। বৈকুণ্ঠ

বাবু সিঁড়ির মাঝখানে থেকেই হাঁক দিলেন, ও নাতবৌ, নাতবৌ গো, বলি ও ছোট গিন্নী······

উপরের হল ঘরে সোফায় বসে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে কি একটা সেলাই করছিল। অচেনা লোক দেখে মাথার কাপড়টা একটু টেনে উঠে দাঁড়াতেই, বৈকুণ্ঠবাবু একেবারে সামনে এসে বললেন—উহুঁ। পালালে চলবে না, একেবারে ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি। নড়লেই হাতকড়ি লাগিয়ে দেব। বাঃ, খাসা বৌ হয়েছে তো বিজয়ের। তারপর, কেমন আছ তোমরা ?

বৌটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—আপনাকে চিনতে পারছিনে তো ?

—কেমন করে চিনবে, বল ? বিয়ের সময় তো আর যেতে পারিনি। তোমাদের দাদু আমি। বিজয় বলে নি বুঝি আমাদের কথা ? আচ্ছা আসুক একবার। কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেব।

মেয়েটি একটু হেসে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বৈকুণ্ঠবাবু তার পিঠে হাত রেখে বললেন, এস, দিদি, এস। হ্যাঁ; তারপরে, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। ছাখ দিকিন কেমন হল ?···বলে কাপড় এবং গয়নার প্যাকেট দুটো তার হাতে দিলেন।

মেয়েটির মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। বৈকুণ্ঠবাবু বললেন—খোল ; খুলে ছাখ। তোমার দিদিমা বুড়ির পছন্দ তো ? কেমন হয়েছে কে জানে ?

বৌটি প্যাকেট খুলতে খুলতে বললে—ইস্ আমার দিদিমাকে আপনি বুড়ি বলছেন! দাঁড়ান আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি গিয়ে। বাঃ কি চমৎকার কাপড়!, ইস্! নেকলেসটা আরও ভাল। এ সব বুঝি দিদিমা পছন্দ করেছেন?

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন—সে ছাড়া আর কে করবে? আমি তো ওসব খুব বুঝি।

—এর পরেও আপনি তাঁকে বুড়ি বলতে চান?

—না, না, না, ষাট্ ষাট্; বুড়ি হবে কেন? তোমার দিদিমাটি একেবারে কচি খুকি···বলে বৈকুণ্ঠবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

চাকর এসে জানাল—মা, বাবু তিন কাপ চা চাইছেন নিচে।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন—বিজয় এসেছে নাকি?

চাকর বললে—আজ্ঞে, নিচে দুজন বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন।

—তাহলে নিচেই যাই, কি বল নাতবৌ?

নাতবৌ বাধা দিয়ে বলল,—না, না, আপনি বসুন। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি ওঁকে।

যেতে যেতে বললে—পালাবেন না যেন; আমি চা নিয়ে আসছি।

একটি আঠার-উনিশ বছরের সুন্দর ছেলে এসে বৈকুণ্ঠবাবুকে প্রণাম করল।

বৈকুণ্ঠবাবু তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—কে তুমি, বাবা?

—আজ্ঞে, আমার নাম নিখিলেশ।

—কার ছেলে তুমি ?

—বিজয়বাবুর ছেলে।

বৈকুণ্ঠবাবু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন—বিজয়ের ছেলে তুমি! আমাদের এই বিজয় ?

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অসম্ভব!

—অসম্ভব মানে ?

—অসম্ভব মানে—এ হতে পারে না।

ছেলেটি রীতিমত রেগে উঠল—কি বকছেন পাগলের মত ? মাথা খারাপ নাকি আপনার ?

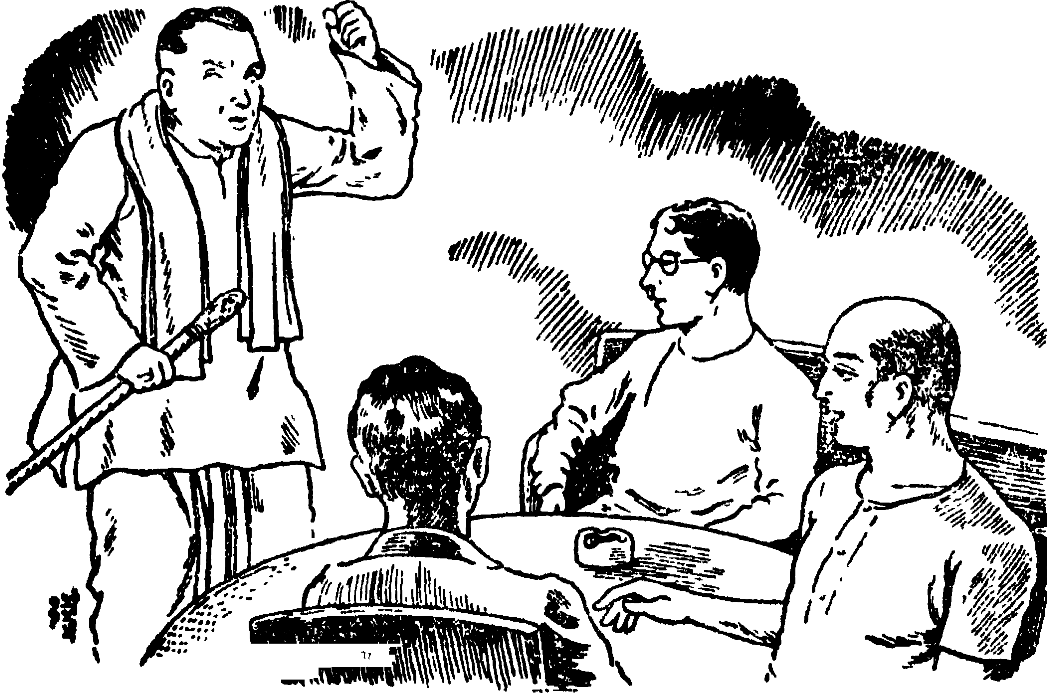
বৈকুণ্ঠবাবু রুখে উঠলেন—মাথা খারাপ আমার, না তোমার ? তোমার মত একটা ধাড়ি হল কিনা বিজয়ের ছেলে! আরে, তার বিয়েই তো হল এই দু বচ্ছর।

নিখিলেশ এই বুড়োকে পাগল মনে করে সরে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে একটি চাকর ছিল; সে এগিয়ে এসে গলা খাটো করে বলল—আজ্ঞে, ইনি হচ্ছেন আমাদের বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে। আর এই মা হচ্ছেন বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ।

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বললেন—দ্বিতীয় পক্ষ! তোমরা সব বলছ কি ? সবাই মিলে আমার মাথাটাই দেখছি খারাপ করে দেবে। আচ্ছা, দাঁড়াও তো!

······বিড় বিড় করতে করতে বৈকুণ্ঠবাবু নিচে নেমে গেলেন।

বসবার ঘরে তিনটি ভদ্রলোক কথা বলছিলেন—ডি. এস. পি. বিজয় সেন, মুন্সেফ সাদেক হোসেন, আর সাব-



ডেপুটি জ্ঞান দত্ত। বৈকুণ্ঠবাবু এসে তিনজনের মুখের দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন।

বিজয়বাবু বললেন, আপনি কাকে চান?

—বিজয়কে চাই।

—আমিই বিজয়।

—আপনি কোন্ বিজয়?

—কোন্ বিজয় মানে?

—মানে, আমি যাকে চাই, তার নাম বিজয় সেন এবং তিনি পুলিশের ডি. এস. পি; রংপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

—আমিই বিজয় সেন ডি. এস. পি। রংপুর থেকে আসছি।

—আপনি বিজয় সেন! ঠাট্টা করছেন নাকি আমার সঙ্গে? বুড়ো হয়েছি বলে চোখ দুটো এখনো এত খারাপ হয় নি।

মুন্সেফ সাহেব বললেন—আপনি কি বিজয়কে কখনো দেখেছেন?

বৈকুণ্ঠ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—দেখেছি মানে? নিজের হাতে মানুষ করেছি। অবিশ্যি তিন বছর দেখি নি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, তিন বছরের মধ্যে লোকের এমনি মাথা জুড়ে টাক পড়ে, গোঁফগুলো সব পেকে যায়, না চামড়াগুলো সব ঝুলে পড়ে?

সাবডেপুটি বাবু নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে বললেন—অনেকগুলো স্ক্রু ঢিলে আছে, দেখছি।

বৈকুণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—ঠিক বলেছেন মশাই। বিজয় সেন-টেন এখানে কেউ নেই। দেখছেন না, এটা একটা জোচ্চোরের আড্ডা।

বৈকুণ্ঠবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—তাই দেখছি। তবে আপনারাও জেনে রাখুন, জোচ্চুরি কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে আমি জানি। বৈকুণ্ঠ দাশকে সবাই চেনে। হুম্—

বৈকুণ্ঠবাবু রেগে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেলেন। পেছনে একটা হাসির রোল উঠল।

চাকর চা নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—সে বুড়োবাবু গেলেন কোথায়?

বিজয়বাবু বললেন—কেন?

—মা ডেকে পাঠিয়েছেন।

তিন জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন

—২—

বৈকুণ্ঠ বাড়ি ফিরলেন আগুন হয়ে। লাঠি আর চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক হাঁক দিলেন—কইগো, জল দাও এক গেলাস।

গিন্নী ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—কি খবর? তারা এল না?

—দুত্তর! পড়েছিলাম এক জোচ্চোরের পাল্লায়। এক টেকো বুড়ো; বলে কিনা—আমিই বিজয় সেন। আসলে সে বিজয় সেনের বাবা।

—আর নাতবৌ? তাকে দেখতে পাওনি?

—কি জানি নাতবৌ না কে? চাকরটা তো বললে দ্বিতীয় পক্ষ।

গিন্নী গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, সে কি কথা? তারপর—কাপড়-গয়না কি করলে?

—সে তো আগেই দিয়ে ফেলেছি। তখন কি জানি এর মধ্যে জোচ্চুরি আছে? উঃ চার-চারশ টাকা ঠকিয়ে নিলে! জোচ্চোর বদমাস ঠক! বেশ, আমিও দেখে নেব···

গিন্নী একেবারে বসে পড়েছিলেন। মুখ শুকনো করে বললেন—তুমি আর কী দেখে নেবে! তারা হল পুলিশের লোক!

বৈকুণ্ঠবাবু বীরত্ব দেখিয়ে বললেন—হলই বা পুলিশের লোক। এই তো মুখের ওপর বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে এলাম। কী করবে ?

গিন্নী ধীরভাবেই বললেন—ভাল কর নি। টাকা তো গেলই। তার ওপর ত্মাখ আবার কি ফ্যাসাদ বাধে।

সে ভয় বৈকুণ্ঠবাবুর মনেও ছিল। কিন্তু বাইরে তিনি চুপ করেই রইলেন।

রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি থামানোর শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই চাকর এসে জানাল দুজন পুলিশের লোক ডাকছে। পুলিশের লোক !

বৈকুণ্ঠবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। গিন্নী কেঁদে ফেলে বললেন—না-না, তুমি যেও না। ওরা ধরে নিয়ে যাবে।

পুলিশের জমাদার বাইরে থেকেই হাঁক দিল—বৈকুণ্ঠবাবু হ্যায় ? জলদি আইয়ে।

বৈকুণ্ঠবাবু চোরের মত এসে দাঁড়ালেন তাদের কাছে।

জমাদার বললে—ডি. এস. পি. সাব আপকো সেলাম দিয়া।

শুকনো গলায় জবাব এল—কি জন্যে ?

—কি জন্যে, ও হামি কি জানে ? হুকুম হল—লিয়ে যেতে। চলিয়ে।

বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠলেন। দরজার আড়ালে গিন্নী হঠাৎ একটা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ঝি মাথায় তেল-জল দিতে লাগল।

বৈকুণ্ঠবাবু মনে করেছিলেন তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাকে আনা হল ডি. এস. পি-র বাড়ির দোতলায়। কিছুক্ষণ পরে সেই নাতবৌ এলেন। একগাল হেসে বললেন—চা না খেয়ে পালিয়ে গেলেন যে বড় ? তাই আপনাকে ধরিয়ে নিয়ে এলাম।

বৈকুণ্ঠবাবু অত্যন্ত শুষ্ক ক্লান্ত ভাবে বললেন—তুমিই আমাকে ডেকেছ ?

—'না, আমিও ডেকেছি'—বলে বিজয়বাবু দেখা দিলেন, এবং প্রণাম করে বললেন—বেয়াদপি মাপ করবেন, দাছু। আপনাকে চিনতে পারি নি।

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—আপনাকেও ঠিক চিনতে পাচ্ছিনে। আপনি তো আমাদের ন্যাড়া নন !

বিজয়বাবু টাকে হাত দিয়ে বললেন—না, ন্যাড়া নই, তবে টেকো। পাশের চুলগুলো পড়ে গেলেই ন্যাড়া হয়ে যাব। তার বেশি দেরিও নেই।

বৈকুণ্ঠবাবু আস্তে আস্তে বললেন—সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

বিজয়বাবু বললেন—আজ্ঞে, না। সবই ঠিক আছে। গোলমাল শুধু একটা নম্বরের।

—তার মানে ?

—আপনি যাকে চান তিনি হচ্ছেন বিজয় সেন দু নম্বর ; আর আমি হচ্ছি বিজয় সেন এক নম্বর। তিনিও ডি. এস. পি-

আমিও ডি. এস. পি। তফাত শুধু ঐ একটা নম্বর। গেজেট দেখলেই বুঝতে পারবেন।

খবরের কাগজের সেই পাতাটা বৈকুণ্ঠবাবুর পকেটেই ছিল। তাড়াতাড়ি বের করে দেখলেন, তাই বটে; বিজয় সেনের নামের শেষে একটা এক নম্বর লেখা আছে।

বিজয়বাবু বললেন—দেখলেন তো? কিন্তু শুধু ঐ একটা নম্বরের জন্যে আমাদের আপনি ত্যাগ করবেন?

—কখখনো না। দাদু বুঝি তেমনি লোক—বলে নাতবৌ একথালা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। বৈকুণ্ঠবাবু দেখলেন, তাঁর নাতবৌ-এর পরনে তাঁরই দেওয়া বেনারসী এবং অন্যসব গয়নার সঙ্গে তাঁরই দেওয়া নেকলেস। সে দিকে চেয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা টন-টন করে উঠল। নাতবৌ তাড়া দিয়ে বলল—কই, খাচ্ছেন না যে? দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে যাব কখন?

যন্ত্রের মত বৈকুণ্ঠবাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। মনে হল, এ চা নয়, এক কাপ কুইনাইন মিকশ্চার।



পেটের জোর

লোকে জমিজমা করে টাকার জোরে, কিংবা লাঠির জোরে। চৌধুরীরা জমিদার হল পেটের জোরে। ব্যাপারটা তাজ্জব হলেও অনেকেরই জানা। যারা জান না, মন দিয়ে শোন।

বেশিদিন নয়, তিন পুরুষের কথা। মুকুল চৌধুরীর ঠাকুর-দাদা গজানন চৌধুরী ছিলেন বেজায় গরিব। জমিজমা যেটুকু ছিল, অন্য কারুর হয়তো চলে যেত; কিন্তু গজাননের পেটটা ছিল সত্যিই গজাননের মত। তারপর আবার তার দুটি পক্ষ এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই দশ-বারটি করে ছেলেমেয়ে! গজাননের দিন আর চলে না। জমির খাজনা বাকী পড়ল। কাছারির পেয়াদা এসে বারংবার শাসিয়ে গেল—জমি কেড়ে নেওয়া হবে। কিন্তু তখনকার দিনে জমিদারদের দয়া-ধর্ম ছিল। গজানন

ভাবলেন, একবার যদি সদরে গিয়ে কর্তাবাবুর কাছে কেন্দে পড়া যায়, খাজনাটা হয়তো মাপ হতে পারে। গিন্নীরাও সেই পরামর্শ দিলেন। তারপর একদিন ভাল দিনক্ষণ দেখে, চাদরে সের দশেক চিড়ে বেঁধে গজানন জমিদারের কাছে চললেন।

পুরো একদিন হেঁটে জমিদারের বাড়ি মিলল। ব্রাহ্মণ বলে গজানন বেশ খাতির-যত্নই পেলেন। অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা হল এবং মস্তবড় সিদেও একটা এসে গেল। জানান হল, খাওয়া দাওয়ার পর তিনটার সময় জমিদারের সঙ্গে দেখা হবে।

তিনটা বাজতেই এক পেয়াদা এসে হাজির। কিন্তু গজাননের তখনও রান্না হয় নি। গালে হাত দিয়ে বসে আছেন; চোখ-মুখ বসে গেছে। পেয়াদা বললে—"কি ঠাকুরমশাই, আপনার এখনও ভোজন হয় নি?"

গজানন একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন—"না ভাই, হয় নি।"

—"কেন?"

—"চালটা এখনও পাই নি।"

—"সে কি! পুরো দেড় সের চাল যে আমি নিজে দিয়ে গেলাম?"

—"সেটা তো ফুরিয়ে গেছে ভাই।".

—"ফুরিয়ে গেছে! রান্না হল না, অথচ চাল ফুরল কি করে?"

গজানন বড্ড লজ্জায় পড়লেন; কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—"স্নান করে উঠে একটু চালজল খেয়েছি।"

জমিদারের কাছে খবর গেল, অতিথিশালায় এক ব্রাহ্মণের এখনও খাওয়া হয় নি। যে "সিদে" দেওয়া হয়েছিল, চালজল খেতেই শেষ হয়েছে। জমিদার তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন, ব্রাহ্মণের যা কিছু দরকার, যেন এখুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দৈ, ক্ষীর, ফল, মিষ্টি—কোনটার যেন ত্রুটি না পড়ে। হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল করা হল। চারদিকে এই ব্যাপার নিয়ে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে জমিদার নিজে চললেন ব্রাহ্মণের খাওয়ার তদারক করতে। সে এক দৃশ্য! গজানন খেতে বসেছেন। একটা মস্তবড় কাঁসার পরাতে পাঁচ-ছয় সের চালের ভাত; তার পাশে এক গামলা ডাল, এক টোকস ভর্তি একটা তিন-সেরি রুইএর ডালনা, দশখানা বেগুন ভাজা, এক বালতি আলুর দম, এক হাঁড়ি দই, এক ঝুড়ি সন্দেশ, এক কাঁদি মর্তমান কলা এবং আরো অনেক কিছু। একজন ব্রাহ্মণ মাছি তাড়াচ্ছেন, দুজনে দুদিক থেকে হাওয়া করছেন, আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন, কখন কি চাই—তার জন্যে।

ভোজন নির্বিঘ্নে সমাধা হল। তারপর সাড়ে তিনঘণ্টা বিশ্রাম। বিশ্রামের পর জমিদার আবার এলেন; প্রণাম করে বললেন—"ঠাকুরমশাই, আপনাকে দেখলে পুণ্য হয়। আপনার পায়ের ধুলোয় আমার গৃহ পবিত্র হল। দয়া করে বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?"

গজানন বললেন—"আমি গরিব ব্রাহ্মণ; আপনার প্রজা।

ছেলেপুলে নিয়ে তুটো পেটভরে খেতে পারি, এই ব্যবস্থা করে দিন। সারাজীবন তু হাত তুলে আশীর্বাদ করব।"

জমিদার হুকুম দিলেন, গজাননের নিজ গ্রাম লখেরচর এবং তার আশেপাশের সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করা হোক। পরদিনই দানপত্র তৈরি হল। গজানন খুশীমনে বাড়ি ফিরলেন।

সেই থেকে চৌধুরীরা জমিদার।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরেই গজানন মারা গেলেন। তারপর তাঁর বার ছেলেয় মিলে লাগিয়ে দিল বার ভূতের নাচ। কেউ কিনল হাতি, কেউ কিনল ঘোড়া, কেউ খুলল যাত্রার দল, কেউ ধরল মদ। দেখতে না দেখতে জমিদারিটা উড়ে গেল—ঠিক ধোঁয়ার মত। ধনবল যখন যায়, জনবল আর দেরি করে না। অতবড় বাড়িটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু একজন—চৌধুরীদের সবেধন নীলমণি, আমাদের মুকুল চৌধুরী। ঠাকুরদাদার জমিদারিটা তার হাতে এসে পৌঁছল না; লাভ হল শুধু তাঁর পেটটা। ফলে আবার সেই টানাটানি—দিন চলে তো রাত চলতে চায় না; আজ চলে তো কাল অচল। মুকুল পাবনা কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল; সেই জোরে খবরের কাগজে "কর্মখালি" দেখে চাকরির দরখাস্ত শুরু করে দিল।

মাস কয়েক কেটে গেল; কোন খবর নেই। শেষটায় একদিন এক চিঠি এসে হাজির—মেদিনীপুর থেকে—আগামী সোমবার বেলা দশটায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে; কয়েকজন কেরানী নেওয়া হবে। সোমবারের তখনও

দিন সাতেক দেরি। কিন্তু মুকুল সেইদিনই বেরিয়ে পড়ল, পাছে চাকরিটা ফসকে যায়।

কালেক্টরী আফিসের বড়বাবু ছিলেন নিকুঞ্জবাবু। তাঁর পিসতুতো ভাই মুকুলের ভগ্নীপতির মামা। আপনার লোকই বলতে হবে, তবে যাতায়াত নেই; তাই চেনাশোনাও হয় নি। তবু মুকুল তাঁরই বাড়িতে গিয়ে উঠল। নিকুঞ্জবাবু, পরিচয় পেয়ে কুটুম্বকে আদর-যত্ন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও বেশ ভাল রকমই হল। সেদিন ছিল কিসের ছুটি। নিকুঞ্জবাবু কুটুম্বকে নিয়ে পাশাপাশি খেতে বসলেন। মুকুলের পাতে প্রথমে যে ভাত দেওয়া হয়েছিল সেটা উঠে গেল চচ্চড়ির সঙ্গেই। তারপর এল আবার ভাত, আবার ডাল; আবার ডাল, আবার ভাত। মাছের ঝাল, ঝোল, অম্বল ইত্যাদি শেষ হবার পর দইতে পৌঁছবার আগেই তার সাতবার ভাত নেওয়া হয়ে গেল। দইএর পাতে চারটি ভাত না হলে মুকুলের খাওয়াটা জমে না। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পেরে হাঁকলেন—"ঠাকুর, ভাত নিয়ে এস।" কিন্তু ঠাকুর আর আসে না। আবার হাঁকলেন; তবু ঠাকুরের সাড়া নেই। রান্নাঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখলেন গৃহিণী হাত নাড়ছেন, আর ঠাকুর ছুটেছে গামলা নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে—চাল চাই। চারজন লোকের খাওয়া বাকি। নিকুঞ্জবাবু বিষম লজ্জায় পড়লেন। কিন্তু উপায় কি?……

ওবেলা থেকে মুকুলের খাওয়ার ব্যবস্থা হল একটা হোটেলে, আর থাকবার জায়গা হল কালেক্টরী অফিসের একতলায় পিওনদের ঘরের পাশে।

পরদিন সকালবেলা। নিকুঞ্জবাবু খবরের কাগজ পড়ছেন। মুকুল ঘরে ঢুকল—মুখখানা কাচুমাচু।

—"কি খবর ?"

—"আজ্ঞে, হোটেলওয়ালা বলছে, ওখানে সুবিধে হবে না।"

নিকুঞ্জবাবু একটু হেসে বললেন—"চার্জটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।"

মুকুল বললে—"ডবল চার্জ দিতে রাজী ছিলাম ; তবু স্বীকার করে না।"

—"তা হলে কি করা যায় ?"

—"আজ্ঞে আপনি যদি অনুমতি দেন, কাছারির ঐ ঘরটাতেই আমি চারটি চাল ফুটিয়ে নিতে পারি।"

সেই ব্যবস্থাই হল।

দেখতে দেখতে সোমবার এসে পড়ল। পনের-ষোল জন লোক ডেকে পাঠানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুকুম করেছেন, ঠিক দশটায় তাঁর আফিসের বারান্দায় সবাইকে দাঁড় করানো হবে। তিনি নিজে দেখেশুনে নেবেন।

সাড়ে নয়টা না বাজতেই, যাদের ডাকা হয়েছিল সব একে একে উপরে উঠতে লাগল। কিন্তু মুকুলের দেখা নেই। বড়বাবু চাপরাশীকে পাঠিয়ে দিলেন তাকে ডেকে আনবার জন্যে। চাপরাশী গিয়ে দেখে, মুকুলবাবু পোশাক চড়াতে গিয়ে ঘেমে অস্থির। প্যাণ্টটা করানো হয়েছিল বছর দুয়েক আগে ; অনেক টানাটানি করেও পেটটা কিছুতেই গলছে না।

চাপরাশীকে দেখে মুকুল যেন হাতে স্বর্গ পেল ; বললে—"একটু ধর তো ভাই। একা একা পেরে উঠছি না।"

চাপরাশীর গায়ে জোর ছিল। খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে পেট হার মানল বটে ; কিন্তু বাবুকে দেখে মনে হল অজগর ছাগল গিলেছে !

চাপরাশী বললে—"এটা খুলে ফেলুন বাবু। সাহেব চটে যাবে।"

মুকুল অবাক হয়ে গেল—বলে কি ! কাপড় পরে কখনো সাহেবদের কাছে যাওয়া যায় ?······

সেইদিন ছিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি-বাড়ি তদারক করবার দিন। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে মুকুলের ঘরে সাহেব হাজির। বারান্দার একধারে একটা প্রকাণ্ড চুলার উপর পাঁচসেরি হাঁড়িতে রান্না চাপানো হয়েছে। তার পাশে চুপড়িতে তরকারী আর গামলায় ভিজানো ডাল। ব্যাপার দেখে সাহেব তো একেবারে আগুন ; বললেন—"কে টুমি ?"

মুকুল জোড় হাত করে বললে—"আজ্ঞে আমি মুকুল চৌধুরী।"

—"ড্যাম্ ইট্ ! এখানে কার হুকুমে হোটেল খুলেছ ?"

—"আজ্ঞে এটা হোটেল নয়। নিজের জন্যে রান্না করছি।"

—"এটো রান্না ! নন্‌সেন্স্ ! বড়াবাবুকো বোলাও।"

চাপরাশীরা ছুটে গিয়ে বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে এল। সাহেব ভীষণ রেগে বললেন—"What is this বড়াবাবু ? কোর্টের মধ্যে হোটেলওয়ালা ! I want him to be driven out

at once." (আমি চাই, ওকে এখুনি তাড়িয়ে দেওয়া হোক)।

বড়বাবু হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি মনে করে-ছিলেন, লোকটা একটা স্টোভ জ্বালিয়ে যাহোক দুটো রেঁধে খাবে। এতবড় একটা যজ্ঞিরান্নার আয়োজন হবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি; ভাবলে, কখনো রান্না করার অনুমতি দিতেন না। যাহোক, ব্যাপারটার জন্যে দায়ী তো তিনিই। তাই সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন—"স্যর, এ লোকটা হোটেলওয়ালা নয়। নিজের জন্যেই রান্না করছে।"

ফল হল উলটো। সাহেব আরও রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন—"Don't think, I am a child (মনে করো না আমি কচি খোকা)! এটা জিনিস একটা লোক খেটে পারে?"

বড়বাবু বেগতিক দেখে চুপ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ঘরে ঢুকে দেখলেন, বিছানার পাশে একটা প্রকাণ্ড ধামায় এক ধামা মুড়ি-মুড়কি, আর তার কাছে এক হাঁড়ি ঝোলা গুড়। বড়বাবু বুঝলেন, ওটা মুকুলচন্দ্রের বিকালবেলার জলখাবার। কিন্তু সে কথা বলবার উপায় নেই। সাহেব ছড়ি নিয়ে ধামাটায় একটা খোঁচা মেরে মুকুলকে বললেন—"টুমি এখনো বলটে চাও টুমি হোটেলওয়ালা নও?"

মুকুলের চট করে মনে পড়ে গেল, তার ঠাকুরদাদা খাওয়া দেখিয়ে জমিদারি পেয়েছিলেন। এগিয়ে এসে বললে—"সাহেব, তুমি যদি অনুমতি দাও, এই এক ধামা মুড়ি আমি তোমার সামনেই খেয়ে ফেলতে পারি।"

সাহেব চমকে উঠে তু-পা পেছিয়ে গেলেন; ভয়ে ভয়ে মুকুলের চোখের দিকে চেয়ে বললেন—"What! তুমি কি পাগল?"



মুকুল মরিয়া হয়ে বললে—"না সাহেব, পাগল নই। আমি গজানন চৌধুরীর পৌত্র। পেটের জোরটা আমাদের বংশগত।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রুখে উঠে বললেন—"ড্যাম্ ইওর গজানন চৌড়ুরী! চাপরাশী, উস্‌কো নিকাল দেও। He must be a crazy fellow (লোকটা নিশ্চয়ই পাগল)!"

মুকুল আবার কি একটা চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু চাপরাশীরা সে সুযোগ দিল না—তাকে জোর করে ধরে একেবারে কাছারির সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে এল।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন—"দুঃখ কোরো না মুকুল। কালের হাওয়া বদলে গেছে। তাই, পেটের জোর দেখিয়ে তোমার দাদামশাই পেয়েছিলেন জমিদারি, আর তুমি পেলে গলাধাক্কা।"



কানাইবাবু স্যর ভয়ানক কৃপণ লোক; হাত দিয়ে তাঁর নম্বর গলতে চায় না। অঙ্কের খাতায় মনোজকে তিনি বরাবরই একটি "O" দিয়ে থাকেন। তবে এবার যেটি দিয়েছেন, তার আকারটা আগের চেয়ে বেশ বড়—এইটুকুই যা সান্ত্বনা। ইংরাজির খাতা দেখেছেন হেডমাস্টার মশাই। বুড়ো মানুষ; দয়াধর্ম আছে; দানধ্যানও করেন শোনা যায়। কিন্তু নম্বরের বেলায় ১০এর বেশী তাঁর হাতে উঠল না। ইতিহাসের স্যর রমেশবাবু যেমনি কাটখোট্টা, তেমনি খিটখিটে; ১২ পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছেন, সেই যথেষ্ট। আর "স্বাস্থ্য?"—খগেনবাবু যে স্বাস্থ্যের কী বোঝেন, তিনিই জানেন। মাসের মধ্যে

দশ দিন ভোগেন কালাজ্বরে, পনেরো দিন গেঁটেবাতে, আর বাকী পাঁচ দিন হাঁপানিতে। অথচ তিনিই দেখেছেন "স্বাস্থ্যের" কাগজ, এবং ঘচ করে বসিয়ে দিয়েছেন ৭। তারপর রইলেন, ভূগোলের স্যর ইস্‌লাম সাহেব। জন্ম থেকে কোলকাতার বাইরে কোথাও পা দেন নি। তিনি কি জানেন—কোথায় আছে স্টকহোলম আর কিসের জন্য বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া? কিন্তু প্রশ্ন করবেন দেড় হাত, আর সবগুলো লিখলেও নম্বর দেবেন ৩। এরকম স্কুলে ভদ্রলোকে কি করে পড়তে পারে, মনোজ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

নম্বরের লিস্টখানা হাতে করে, এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনোজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল। মনটা তার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। গেলবারেই তার বাবা বলে রেখেছেন, "আসছে পরীক্ষাতে যদি ভাল করতে না পার, দোকানে যেতে হবে।" তাদের একটা মসলার দোকান আছে। সেখানে বসে বসে জিরে পাঁচফোড়ন ওজন করতে তার বড্ড খারাপ লাগে। কোন উপায়ই চোখে পড়ে না। তার বাবা একেবারে এক কথার লোক।

বাড়ি ফিরে তার মাথায় একটা সোজা উপায় এল। নম্বরগুলো বাড়িয়ে দিলে দোষ কি? বাবা তো সেকেলে লোক, চোখেও কম দেখেন; কিছুই ধরতে পারবেন না। নম্বরের কাগজখানা খুলে সে মনের আনন্দে যা খুশি বসিয়ে যেতে লাগল। ১০এর বাঁদিকে বসাল ১, ১৩র ডান দিকে শূন্য। ৭এর বাঁদিকে ৯; ৩এর আগে ৮। হোক না নিজের হাতে;

তবু অনেক দিন পরে মোটা মোটা নম্বর পেয়ে মনটা পালকের মত হাল্‌কা হয়ে গেল।

কিন্তু ঐ যে ইংরাজিতে একটা কথা আছে, মানুষ জল্পনা-কল্পনা করে, ভগবান দেন ভেস্তে। নম্বর দেখে তার বাবা গেলেন ক্ষেপে ; বললেন,—যে ছেলে ১০০র মধ্যে ১১০ পায়, তার বিদ্যে অনেক হয়ে গেছে। ইস্কুলে তার দরকার নেই। কাল থেকে তুমি দোকানেই বসবে।

মনোজ বুঝল, এ হুকুমের উপরে আপীল নেই। দোকানে তাকে যেতেই হবে। মা নেই যে একবার কান্নাকাটি করে দেখবে। থাকবার মধ্যে আছে এক মাসতুতো দিদি। ভবানীপুরে মামার বিয়েতে একবার শুধু তার সঙ্গে দেখা। তাকে অবিশ্যি খুব ভালবাসেন। কিছুদিন হল ওরা বর্ধমানে এসেছেন বদলি হয়ে। এসেই তাকে যাবার জন্যে লিখেছেন। সেখানে গেলে কেমন হয়? বর্ধমান বেশ জায়গা, সীতাভোগ-মিহিদানার দেশ। সেখানে পড়লে বেশ হয়। মাস্টার মশাই কানাইবাবুর মত কৃপণ নন, রমেশবাবুর মত কাঠখোট্টাও নন।

…ভাবতে ভাবতে একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনো ভাল করে ফর্সা হয় নি। মনোজের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বর্ধমানের দিদির কথা। চট করে জামাটা পরে সে বেরিয়ে পড়ল, অন্য সকলে উঠবার আগে। বড়বাজারের কাছেই তাদের বাসা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হাওড়া স্টেশনে এসে পড়ল।

তিন নম্বর প্লাটফরম থেকে তখন একটা গাড়ি ছাড়ছে।

গেটে টিকিট-চেকার টিকিট দেখছেন। মনোজ জিজ্ঞেস করল—এ গাড়ি কোথায় যাবে বলতে পারেন, স্যর ?

চেকার বললেন—বর্ধমান।

ঠিক সেই সময়ে কতগুলো লোক এসে পড়ল—একগাদা লটবহর নিয়ে। চেকার তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই ফাঁকে মনোজ আস্তে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল প্লাটফরমে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গার্ড সাহেবও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। গাড়িটাও দাঁড়িয়েছিল বেশ খানিকটা দূরে। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে যখন সে পৌঁছল, গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। মনোজ এক মুহূর্ত কি ভেবে নিল। তারপর গার্ড যেমনি লাফ দিয়ে তাঁর গাড়ির পাদানিতে উঠতে যাবেন, মনোজ দু হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—আমাকে নিয়ে যান, স্যর! গার্ডসাহেব আটক! প্লাটফরমসুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে উঠল, এবং চক্ষের নিমেষে একটা হাট জমে গেল—কুলি, পুলিশ, "চানাচুর-ওয়ালা," "পাউরুটি বিস্কুট" "চা গরম!" গাড়িটাও কয়েক হাত গিয়ে থেমে গেল। মনোজ সুযোগ বুঝে চট করে উঠে পড়ল এক কামরায়। যারা ভিড় করেছিল, বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়িও দিল ছেড়ে।

মনোজ যে কামরায় উঠেছিল, সেটা বেশ বড়। তার অর্ধেক বেঞ্চিগুলো দখল করে শুয়ে আছে জন পাঁচ-ছয় কাবলিওয়ালা, আর বাকী অর্ধেকটায় কোন রকমে ঠাসাঠাসি করে রয়েছে প্রায় ত্রিশ জন বাঙালী। কাবলিওয়ালাদের

উঠতে বলবে এমন সাহস কারুর হয় নি। মনোজ চারদিকে কোথাও একটু বসবার জায়গা দেখতে পেল না। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার পাশেই এক প্রকাণ্ড বুড়ো কাবলি সটান শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে উঠছে তার নাকের শব্দ; অতবড় গাড়িটা গমগম করছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মনোজের হাতটা ঢুকে গেল পকেটে এবং বের করল একটা নস্যির কৌটো। আর একবার তাকিয়ে দেখল—সব কাবলি ঘুমে বিভোর। তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে এক টিপ নস্যি নিয়ে তুলে ধরল ঐ বুড়ো কাবলির নাকের ডগায়।

বেদম হাঁচির বেগে কাবলি যখন লাফিয়ে উঠে পড়েছে, মনোজ কোত্থেকে একটা পাখা যোগাড় করে চটপট চালিয়ে দিল তার মাথার উপর।

কাবলি তখন হেঁচে চলেছে—ছাদফাটানো বিকট হাঁচি—এক, দুই, তিন···করে পঁচিশটা। দম বেরিয়ে যায় যায় এমনি অবস্থা। মনোজ পাখা ফেলে শুরু করল বুকে মালিশ। পুরো আধঘণ্টা পরে কাবলি একটু সুস্থ হল, এবং মনোজকে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ভাঙা মোটা গলায় ঘজ-ঘজ করে যেটা বলল, সেটা গালাগালি না কৃতজ্ঞতা মনোজ ঠিক বুঝল না।

আপ কাঁহা যায়েঙ্গে খাঁ সাহেব—মনোজ জিজ্ঞেস করল।

খাঁ সাহেব আর একদফা হাঁচি শেষ করে জানাল—বড়দোয়ান।

দু-চার মিনিট বসেই কাবলিকে আবার শুয়ে পড়তে হল।

মনোজ বসে রইল তার মাথার কাছে নাক চেপে ধরে। বোঁটকা গন্ধে মনে হল—পেটের নাড়ীগুলোসুদ্ধ বেরিয়ে আসবে।

শ্রীরামপুর বড় স্টেশন। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই মনোজ নেমে পড়ল। তার পরেই দেখা গেল—একটি ছেলে, মাথায় মুখে কাপড় জড়ানো—কাবলিদের কামরায় পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—বড়দোয়ান, বড়দোয়ান—বড়দোয়ান!

'বড়দোয়ান' কানে যেতেই বুড়ো কাবলি ধড়মড় করে উঠে পড়ল, এবং হাঁকডাক করে সবাইকে টেনে তুলে, মোটঘাট নিয়ে নেমে গেল। পরক্ষণেই গাড়ি ছেড়ে দিল এবং মাথার কাপড় ফেলে মনোজ উঠে এল তার কামরায়। চারদিকটা একদম ফাঁকা। সবাই হাত-পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়েও পড়ল। মনোজকে নিয়ে একটা আলোচনা হল। কেউ বললে—খাসা ছেলে, কেউ বলল—একখানা চীজ, কেউ কেউ কাছে ডেকে আলাপ করল—খোকা তোমার নাম কি, বাড়ি কোথায়? ইত্যাদি।

—২—

শ্রীরামপুর ছাড়াতেই এক ক্রু দেখা দিলেন। মনোজের বুকটা কেঁপে উঠল। সম্বলের মধ্যে তো এক নস্যির ডিবে। তা দিয়ে কাবলি তাড়ানো যায় বটে, কিন্তু ক্রুকে ভোলানো যাবে না।

টিকেট! টিকেট!···সবাই টিকেট দেখাচ্ছে। ক্রমে মনোজের পালা এসে গেল।

টিকেট !···

মনোজ পকেটে হাত দিয়ে কি ভাবল। তারপর নস্যির ডিবেটা বের করে বলল—একটু নেবেন স্যর ?

ক্রু গম্ভীর ভাবে বলল—ও-সব ফাজলামি রেখে দিয়ে টিকেট দেখাও খোকা। এই বয়সেই বেশ পেকে উঠেছ দেখছি।

মনোজ যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমনি ভাবে বলল—ও-ও টিকেট ? ঐ ওঁর কাছে আছে—বলে, গাড়ির ওপাশে একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলে।

ক্রু তাঁর কাছে গিয়ে মনোজের টিকেট চাইলে।

ভদ্রলোক—তাঁর নাম দীনেশবাবু—প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারলেন না। বললেন—কার কথা বলছেন ? আমার সঙ্গে তো আর কেউ নেই।

ক্রু—আজ্ঞে আমি ঐ ছেলেটির কথা বলছি। ও যে বললে, আপনার কাছে ওর টিকেট আছে।···এই খোকা, এদিকে এস তো।

দীনেশবাবু—ওঃ, এর কথা বলছেন। হ্যাঁ, তা ইনি বলতে পারেন সবই। এরকম ধুরন্ধর ছেলে বড় একটা দেখা যায় না।

ক্রু—তাহলে ও আপনার সঙ্গেই যাচ্ছে ?

দীনেশবাবু রেগে উঠলেন—আমার সঙ্গে মানে ? আপনি বলছেন কি ?

ক্রু মনোজের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—ইনি তোমার কে হন, খোকা ?

মনোজ একবার এগিয়ে এসেছে, আর পেছিয়ে যেতে পারে

না। গোটা   ঢোক গিলে বলে ফেলল—উনি আমার ভগ্নীপতি।



দীনেশবাবু রীতিমত ক্ষেপে উঠলেন—What! আমি ওর ভগ্নীপতি! জীবনে ওকে চোখে দেখি নি মশাই। জোচ্চোর! রীতিমত জোচ্চোর! ওকে পুলিশে দেওয়া দরকার। বললে কিনা আমি ওর ভগ্নীপতি!

রগড় দেখে দু-চারজন লোক এগিয়ে এসেছিল। একজন দুধের ভেণ্ডর সবাইকে ঠেলে সমানে এসে দাঁড়াল, দীনেশবাবুর কাছে এসে বলল—পয়সাটা ফেলে দিন মশাই। জোচ্চোর যে কে সে কথা আমরা সবাই বুঝতে পেরিছি। ছিঃ ছিঃ! ছুটো

পয়সা বাঁচাবার জন্যে নিজের শালাকে বলছেন কেউ না? আচ্ছা ভদ্দরলোক!

গয়লার চেহারা এবং হাতে বাঁক দেখে দীনেশবাবুর মেজাজটা একটু খাটো হয়ে এল। সবার দিকে চেয়ে কাতর ভাবে বললেন—আপনারা বিশ্বাস করুন, সত্যিই ও ছেলেটা আমার কেউ নয়।

ডেভিড কোম্পানীর অরুণবাবু ছিলেন ডান পাশে; রুক্ষভাবে বললেন—এতগুলো লোকের কাছে ধরা পড়েও আপনার লজ্জা হচ্ছে না—এটাই আশ্চর্য! লোকে রাস্তার লোককে ভগ্নীপতি বলে জড়িয়ে ধরে, এই কথা আপনি আমাদের বোঝাতে চান?

উত্তরে দীনেশবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ক্রু বাধা দিয়ে বললে—যাক; ওসব কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আপনি ওর ভাড়া আর জরিমানা দেবেন কিনা বলুন। না দেন তো ওকে পুলিশে যেতে হবে।

অরুণবাবু বললেন—তা কখনো হতে পারে না। ওঁর দোষে ঐ ছেলেমানুষ জেলে যাবে? ভাড়া আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তবে ভগ্নীপতিটিকে আমরা একবার দেখে নেব।

চার-পাঁচজনে সায় দিলে। গয়লা বললে—নিন, আমি দিচ্ছি এক টাকা!

দীনেশবাবু একবার তার কুড়িয়ে-পাওয়া বড় কুটুম্বের দিকে, আর একবার রুখে-যাওয়া জনতার দিকে চেয়ে পকেট থেকে মনিব্যাগটা নিয়ে একখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলেন

ক্রু-ম্যানের গায়ে—নিন, মশাই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে অনেক দণ্ডই দিতে হয়। কিন্তু রাস্তার লোকের ভগ্নীপতি সাজতে হবে—এতটা আশা করি নি।

বর্ধমানে গাড়ি থামল। সবাই নামছে। মনোজকেও নামতে হল। কোথায় তার দিদির বাড়ি সে জানে না। এমন কি ভগ্নীপতির নাম কিংবা ঠিকানাটাও মনে নেই যে লোককে জিজ্ঞেস করবে। এদিকে দীনেশবাবু নেমেই হন-হন করে চলতে শুরু করেছেন।

অরুণবাবু এসে বললেন—কি খোকা, তোমার জামাইবাবু যে চলে গেলেন তুমি যাচ্ছ না? সঙ্গে সঙ্গে না গেলে আবার টিকেট চাইবে।

মনোজ এখন কেমন করে বলে যে উনি তার জামাইবাবু নন? অগত্যা আবার টিকেট-বিভ্রাটের ভয়ে সে এগিয়ে চলল এবং গেট পার হতে আর কোন বেগ পেতে হল না।

অরুণবাবু কাছে কাছেই ছিলেন। তাঁর ভাইও রয়েছে সঙ্গে। সুটকেসটা ভাই-এর হাতে দিয়ে বললেন—নে তো তরুণ। ছেলেটাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। যেতে সাহস করছে না।

তারপর মনোজকে বললেন—এসো খোকা, আমার সঙ্গে। ভয় কি?

মনোজের না গিয়ে উপায় নেই। দীনেশবাবু অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা জোরে জোরে পা ফেলে গিয়ে ধরল।

দীনেশবাবু ফিরে তাকাতেই অরুণবাবু বললেন—ছেলেমানুষ শ্যালকটিকে একা ফেলে চলে এলেন? আপনার তো বেজায় রাগ দেখছি!

দীনেশ—দেখুন, আমি একশ বার বলছি, এটি আমার শ্যালক নয়। তবু আপনারা আমার পেছু নিয়েছেন কেন বলুন তো? জানেন, আপনাদের দুজনকেই আমি পুলিশে দিতে পারি?

অরুণ—আহা-হা, চটছেন কেন, মশাই! আগে বাড়ি চলুন, শ্যালকটিকে খেতে-টেতে দিন। তারপর, না হয়, দেবেন আমাদের জেলে।

বৈঠকখানায় ঢুকে দীনেশবাবু ওদের বসিয়ে নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন—তারপর? এবার বলুন তো আপনাদের মতলবটা। আপনারা কি চান? টাকা আমি আর দেব না।

অরুণবাবু বললেন—আজ্ঞে না, টাকা চাই না। এবার উঠতে চাই।··যাও খোকা, বাড়ির ভেতরে যাও।

দীনেশবাবু রুখে উঠলেন—বাড়ির ভেতরে! তোমরা কি ডাকাত নাকি হে? কথা নেই, বার্তা নেই, একটা উটকো লোক চলে যাবে বাড়ির ভেতর! পুলিশ ডাকব?

চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ছেলেরা এসে আগেই জুটেছিল; এবার পরদার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে তাদের মায়ের আঁচলটাও দেখা গেল। দীনেশবাবু আর একবার পুলিশ ডাকবার হুমকি দিলেন এবং সেই সময়ে তার মেয়ে এসে বলল—বাবা, মা ওকে ভেতরে যেতে বলছেন।

দীনেশবাবু রুক্ষভাবে বললেন – কেন ?

—দরকার আছে।

মনোজকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে একবার মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে বলল—দিদি, তুমি !

দিদি তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন—হ্যারে, তুই কোথেকে ? আহা, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

দীনেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—চিনতে পারছ না ? এ যে আমাদের মনোজ—ছোট মাসীমার ছেলে।

দীনেশবাবু তো একেবারে হাঁ ! মিনিট তিনেকের মধ্যে খেয়ালই হল না যে এবার মুখ বোজা দরকার।

তারপর ?—তারপর অরুণবাবু মস্ত বড় ভোজ খেয়ে বাড়ি ফিরলেন।



পনেরো বচ্ছর পরে দেশে ফিরছি। যা দেখে গিয়েছিলাম, তার অনেক কিছুই নেই। সে শ্রী নেই, সে স্বাস্থ্য নেই, সে আনন্দ নেই। চলতে চলতে আনমনে এই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকলে—কে, অমল নাকি? ফিরে দেখি, একটি দেশী সাহেব। প্যান্টের ঝুল গোড়ালি থেকে আধ হাত উপরে উঠে গেছে। তার রংটা আগে বোধহয় শাদাই ছিল, এখন হয়েছে তামাটে। কোটের ঘের আর পেটের বেড়ে চলেছে জোর কম্পিটিশন। বোধ হয় কোটকেই হার মানতে হবে। হঠাৎ চিনতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন—কি হে, চিনতে পাচ্ছ না? আমি মাধব।

হেসে বললাম,—কি করে চিনব বল? একেবারে সাহেব হয়ে গেছ!

মাধব পকেট থেকে তার বুক দেখার যন্ত্রটা বের করে গলায় ঝুলিয়ে বলল—কি করব ভাই? যে ব্যবসা করি, একটু ভড়ং টড়ং না হলে কেউ আমলই দেয় না।

—ডাক্তার হয়েছ কদ্দিন হল?

তা, হল বছর তিনেক। এস না? এই তো ডিসপেনসারি। কত কাল পরে দেখা। সব খবর-টবর শোনা যাক।

মাধবের ডিসপেনসারি মানে একখানা টিনের একচালা। ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া। দরজার পাশে ঝুলছে একটা কাঠের সাইনবোর্ড—বড় বড় অক্ষরে লেখা—ডাক্তার এম. সি. কাননগু, এম-বি। রীতিমত চমকে উঠলাম। কেননা, বেশ ভালো করেই জানি, মাধব বার দুই ম্যাট্রিকে ঘায়েল হবার পর, বার বার তিনবার বলে যখন কোমর বেঁধে লাগল, নতুন হেডমাস্টার মশায়ও বেঁকে বসলেন; টেস্টে ওকে কিছুতেই অ্যালাউ করলেন না। সেই মাধব এম-বি হল কবে এবং কেমন করে? কথাটা জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবছি। দরকার হল না। সে নিজেই বললে—ভড়কে যেয়ো না। ব্রাকেটের মধ্যে "এইচ" আছে।

দেখলাম, তাই বটে। "এম-বি" কথাটার নীচে ছোট্ট করে একটা "এইচ" লেখা আছে—এত ছোট যে খুব কাছে না গেলে চোখে পড়ে না। এটাও বোধ হয় ওর ঐ বিলাতি সুটের মতই আর-একটা "ভড়ং"। লোকে জানুক সে একজন সত্যি সত্যি এম-বি—হোমিওপ্যাথিক এম-বি নয়।

ডিসপেনসারি-ঘরে একটা লোহার চেয়ারে বসলাম।

সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছি, মাধব রা রা করে উঠল—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওষুধের আলমারি খোলা। সব নষ্ট হয়ে যাবে।—বলে তাড়াতাড়ি আলমারি বন্ধ করে তার উপর একটা চট টাঙিয়ে দিল। তারপর, সাহেবি পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে হুঁকো নিয়ে এসে বসল।

আমি বললাম—তারপর, তুমি ডাক্তার হলে কেমন করে—সেই সব বল।

—ডাক্তার হলাম কেমন করে?—মাধব শুরু করল—সে এক রীতিমত কাহিনী। লেখাপড়া খতম করে বাড়িতেই বসে ছিলাম। বাবার গালাগালি, আর মাঝে মাঝে খড়মের ঘা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল। তখন একদিন গোটা কয়েক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। সারাদিন চাকরির চেষ্টায় ঘুরি। কোথায় চাকরি? শেষটায় জুটল এক চামড়ার দালালি। মাইনে-টাইনে কিছু না; শুধু দুটো খেতে দেয়, আর এক বোঝা দুর্গন্ধ চামড়ার নমুনা ঘাড়ে চাপিয়ে দৌড় করায়—শ্যামবাজার থেকে বেলেঘাটা। এই অবস্থায় একদিন দেখা হয়ে গেল মামার শালা বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে। সব কথা শুনে তিনি বললেন, এসব কি করছ? দেশে যাও; গিয়ে হোমিওপ্যাথি কর।

বললাম, সেও তো পড়তে হবে; শিখতে হবে।

মামার শালা মুখে একটা শব্দ করে বললেন, আরে দূর! হোমিওপ্যাথি আবার কেউ পড়ে? এক বাক্স ওষুধ আর একটা

সাইনবোর্ড কিনে নিয়ে যাও। তারপর অমুক চন্দ্র এম-বি বলে লেগে পড়। শিখবার মধ্যে শুধু আছে একটা ছড়া।

বললাম, কিসের ছড়া ?

বিশ্বনাথ বাবু নোট-বুক বের করে বললেন, লিখে নাও। লিখে নিলাম—

পেট কামড়ানি, কাশি ঠন ঠন,
সিনা ইপিকাক দেবে ঘন ঘন।

ঘুষঘুষে জ্বর পেটজোড়া পিলা,
চোখ বুজে দাও পালসেটিলা।

বুক ধড়ফড়, কান কট কট,
দাও রাস্‌টক্‌স্‌, যাবে চটপট।

মামার শালা বললেন, এইটিই হচ্ছে হোমিওপ্যাথির বীজমন্ত্র।

কথাটা মনে লাগল। সেইদিনই সাইনবোর্ডের অর্ডার দিলাম এবং তিন দিন পরেই ফিরলাম বাড়ি। তার পরেই এই ডিস্‌পেনসারি। তা, তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে একেবারে মন্দ হচ্ছে না। তবে—

গলায় চাদর, বগলে শাদা কাপড়ের ছাতা, হাতে চটিজুতা একটা লোক মুখ বাড়াল। মাধব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—কাকে চাই ?

—ডাক্তারবাবুকে চট করে ডেকে দিতে পার ?

—কোথায় যেতে হবে ? কি অসুখ ?

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল—সে কৈফিয়তটা তোমাকে নাই বা দিলাম। যা বলবার ডাক্তারের কাছেই বলব।

মাধব একটু থেমে বলল—আমাকে বলতে পারেন। আমিই ডাক্তার।

লোকটা যেন ভূত দেখেছে, এমনি ভাবে কিছুক্ষণ সেই লুঙ্গি-পরা ছোকরা ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে বলল—তুমি ডাক্তার? অ্যাঁ? তুমি ডাক্তারির কি বোঝ?

এইবার মাধব চটল। বেশ একটু ঝাঁজ দিয়ে বলল—নাঃ। যা কিছু বোঝেন তোমাদের ঐ ফোকলামুখো দিগম্বর সান্যাল! তার কাছেই যাও।

লোকটা এক মুখ দাঁত বের করে হেসে উঠল—আরে বাপু, পাশই কর আর সাইনবোর্টই লাগাও, তোমার মত ছেলে-ছোকরার হাতে কে প্রাণটা তুলে দেবে, বল?

মাধব আপন মনে গজগজ করতে লাগল।

দিন কয়েক পরে একদিন সকালবেলা মাধবের ডিসপেন-সারিতে গিয়ে দেখি পাড়ার কয়েকটি নিষ্কর্মা ছোকরা বসে আড্ডা দিচ্ছে। মাধব নেই। একটু পরেই সে এল—একেবারে হন্তদন্ত হয়ে। তার বিলাতী স্যুট তখন ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে। কে একজন বললে—আজ কি রকম হল, ডাক্তার?

মাধব পকেট থেকে গোটা পাঁচেক টাকা টেবিলের উপর ফেলে বলল—আর বোলো না, ভাই! সারাদিন রোদে

তেতে এই পাঁচটি টঙ্কা! কালও এর বেশী পাইনি। এমন হলে কি আর ডিসপেনসারি রাখা চলে?

আমি বললাম—গ্রামে বসে এর চেয়ে আর কত বেশী আশা কর? এ তো বেশ হচ্ছে।

সকলের মুখে কেমন একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। একটি ছোকরা বলে উঠল—টাকা কটা বদলাও মাধবদা। ওগুলো আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে।

মাধবের মুখখানা হঠাৎ ছাইএর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে, যেন শুনতে পায় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—তারপর, কিছুদিন আছ তো?

—না। শীগগিরই ফিরতে হ'বে। যে রকম অসুখ বিসুখের বহর দেখছি, গ্রামে আর থাকতে সাহস হচ্ছে না।

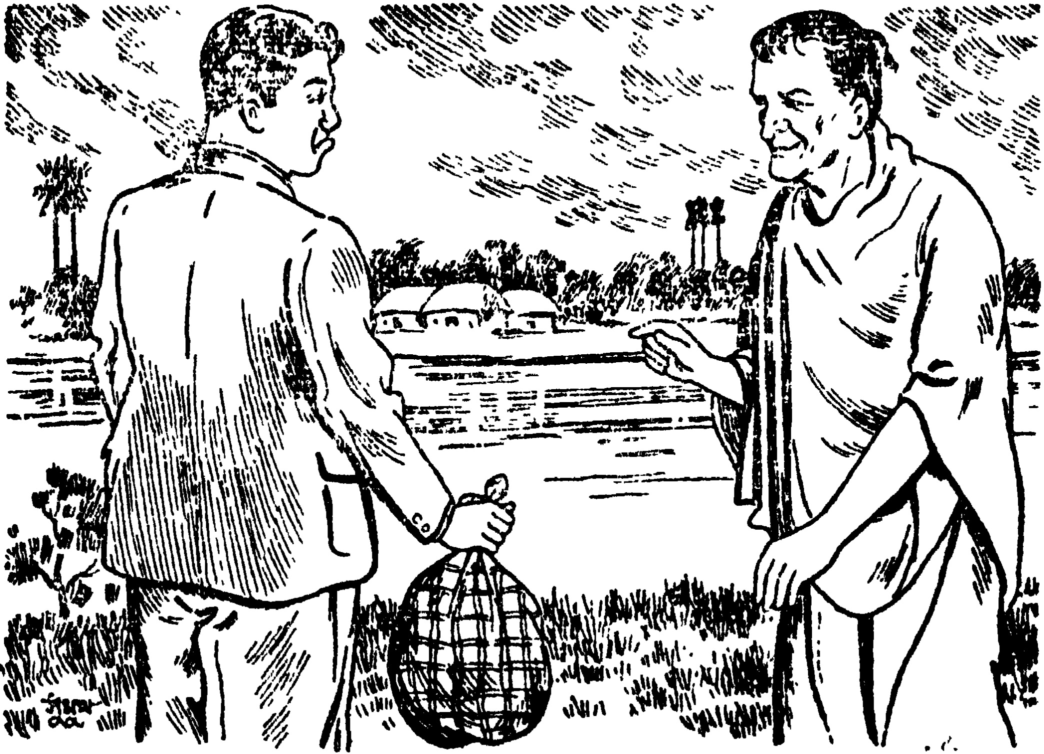
মাধব বললে—অসুখ? সেজন্যে ভাবনা কিসের? আমি রয়েছি কি জন্যে?

মাধব যতই অভয় দিক, দু-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা ফিরতে হল। ক্রমে মাধবের কথাও মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে এলো। এমন সময় একদিন শুনলাম, গ্রামের লোকেরা তাকে একঘরে করেছে এবং সে তার ওষুধের বাক্স-টাক্স নিয়ে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। একঘরে করার কাহিনীটা বেশ নতুন ধরনের। তাই মনে আছে।

আজগর মোল্লার ছেলের হয়েছিল কালাজ্বর। মাধবের ওষুধ খেয়ে সেরে উঠল। আজগর গরিব মানুষ। কি দিতে না

পেরে দিলে ছুটো মুরগী। এই পাখিটির উপর মাধবের একটু গোপন লোভ ছিল। কিন্তু সাবধান না হলে এ জিনিসটা সামলানো কঠিন হবে। সে কথা সে জানত। তাই, সেদিন ভোর না হতেই, ও ছুটোকে বেশ করে গামছায় বেঁধে সে চলেছিল নদীর ধার দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে মহাদেব শিরোমণি মশাই প্রাতঃস্নান সেরে গঙ্গাস্তব পড়তে পড়তে ফিরছিলেন ঐ একই রাস্তায়। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

শিরোমণি বললেন—কি হে ডাক্তার, ওটা কি নিয়ে যাচ্ছ?



মাধব চট করে বলল—আজ্ঞে, এটা একটা কাঁঠাল।

বলতে না বলতেই গামছা-বাঁধা কাঁঠাল হঠাৎ জোর গলায় সাড়া দিয়ে উঠল—কোঁ কড় কোঁ……।

শিরোমণি নাক টিপে ধরে এবং কানে আঙুল দিয়ে কোন

রকমে বাড়ি ফিরলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার দশজনকে ডেকে মাধবের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিলেন। তারপর থেকেই মাধবের আর কোন পাত্তা নেই।

মাধব থাক আর না থাক, দিন কারো বসে থাকে না। দেখতে দেখতে তিন-চার বছর কেটে গেল। পড়াশুনা ছেড়ে শুরু হয়েছে রোজগার। মাধব কিংবা তার হোমিওপ্যাথির ছড়া মনে রাখবার মত অবসর নেই।

বর্ধমান শহরে থাকি। মিহিদানা, সীতাভোগের দেশ; নিন্দা করতে চাই না। তবে একথা নেহাত্ সত্যের খাতিরে বলতে হবে যে, আমার বাড়িটি কিছুদিনের মধ্যে রীতিমত হাসপাতাল হয়ে দাঁড়াল। একধার থেকে পেটের গোলমাল। তার মধ্যে একটু ভাবিয়ে তুললেন বড় ছেলে শ্রীমান বিশ্বম্ভর। অ্যালোপ্যাথিকদের একমাত্র সম্বল কার্মিনেটিভ মিকশ্চার। কয়েক ঘড়া শেষ হল, কিন্তু রোগের সুরাহা হল না। তারপর এলেন কবিরাজ। অরিষ্ট, রসায়ন, বটিকা এবং পাঁচনের ঝড় বয়ে গেল—"প্রাতে, মধ্যাহ্নে বৈকালে ও সন্ধ্যায়"। অনুপানের অনুসন্ধানে একটা গোটা জঙ্গল সমূলে উড়ে যাবার উপক্রম, কিন্তু অসুখের মূল নড়ল না। হেকিমির খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে মুন্সেফ গগনবাবু এসে বললেন, হোমিওপ্যাথ দেখান।

হোমিওর নাম শুনেই মনে পড়ে গেল মাধবকে আর তার সেই বিচিত্র ছড়া—পেট কামড়ানি, কাশি ঠনঠন।

গল্পটা ওঁকে শোনালাম। কিন্তু হোমিওর ওপর গগনবাবুর অচলা ভক্তি। বললেন, আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি খাঁটি ডাক্তার। টাটকা-পাশ-করা ছেলে-ছোকরা নয়। আপনার মাধবের মত হাতুড়েও নয়, প্রাচীন এবং পাকা লোক। আমরা সবাই তাঁকে ডাকি। জজসাহেবের বাড়িতে ওঁকে রোজই একবার যেতে হয়। ফি বেশী নয়, আট টাকা। একটা কল দিয়ে দেখুন না?

অগত্যা রাজী হতে হল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার এলেন। নামটি বেশ—বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত। দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। চোখ দুটো শান্ত। চুলগুলো একদম সাদা। মুখে রবীন্দ্রনাথের মত পাকা দাড়ি। অত্যন্ত ধীরে ধীরে রোগীর পাশে এসে বসলেন, এবং কেবল নাড়ীটাই দেখলেন দশ মিনিট ধরে। আমাদের যা বলবার বলে গেলাম। শুনে শুধু মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বললেন—বাথরুমটা কোন দিকে?

বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে রোগীর ঘরটা একবার ঘুরে এসে দেখি—বসবার ঘরে বসে আছে মাধব, রীতিমত চমকে উঠলাম। খুশীও হলাম খুব। এখানে এতদিন পরে, এমন সময়ে মাধবকে দেখতে পাব, একেবারেই আশা করি নি। চেহারাটা তেমনি ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষই আছে; শুধু আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে। দু-চারটে কুশল প্রশ্নের পর উঠল দেশের কথা, ছেলেবেলাকার কথা। এমন সময়

চাকর এসে বলল "মাঈজি" জানতে চেয়েছেন ডাক্তার বাবু ওষুধ দিয়েছেন কিনা? তাই তো! ডাক্তারবাবু কোথায় গেলেন? এখনও বাথরুম থেকে বেরোন নি? মাধবকে বললাম, একটু বোসো ভাই, এখনি আসছি!

বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে কেউ নেই। তারপর এ-ঘর, ও-ঘর, বারান্দা নীচে উপরে সব খুঁজে দেখা গেল। ডাক্তারবাবু নেই। ব্যাপার কি?

ভৌতিক কাণ্ড! বসবার ঘরে ফিরে আসতে মাধব বললে, কাকে খুঁজছ?

খুঁজছি আমাদের ডাক্তারবাবুকে—ডাক্তার বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত। চেন নাকি তুমি?

—চিনি বৈকি?

—লোকটা কি ক্ষ্যাপা নাকি হে? হঠাৎ 'বাথরুম কই'—বলে একেবারে উধাও হয়ে গেল!

মাধব একটু হেসে বলল—উধাও হয় নি, এই ঘরেই আছে।

এই ঘরেই আছে! তুমিও ক্ষেপলে নাকি?

মাধব এর কোন উত্তর দিল না। পকেট থেকে বের করল একটা সাদা পরচুলা আর পাকা চাপদাড়ি; মুখের সামনে গোটা তিনেক বাঁধানো দাঁত ছিল; ফেলল খুলে। কথা বলব কি? আমি শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ম্যাজিক নয়, স্বপ্নও দেখছি না। আমি শ্রীঅমলচন্দ্র রায়, সজ্ঞানে এবং রীতিমত জেগে বসে দেখছি যে, আমার সামনে যে লোকটি

বসে আছেন, তিনি মাধব কাননগু নন, একেবারে জলজ্যান্ত বিরিঞ্চিভূষণ সিদ্ধান্ত !

অনেকক্ষণ পরে কথা বলবার মত অবস্থা যখন ফিরে এল, বললাম—তুমি এই বহুরূপী ব্যবসা ধরেছ কদ্দিন থেকে ?

মাধব বললে—কি করব, ভাই! এই বহুরূপীই তো তোমরা চাও।

—তার মানে ?

—মানেটা একটু খুলেই বলি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, যতদিন দেশে ছিলাম, 'ছোকরা' 'ছোকরা' করে কেউ আমলই দিলে না ; তার পর করলে একঘরে। চলে গেলাম জলপাইগুড়ি। বড় লোকের দেশ। বেশ বড় করে দিলাম ডিসপেনসারি। নতুন নতুন চেয়ার, টেবিল. সোফা, আলমারি। স্যুট করালাম বিলিতি দোকান থেকে। ফল কি হল ? সেই এক কথা—ছোকরা ডাক্তার ! আর আমারি পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ভাঙা তক্তপোশে বসে একটা লোক শুধু জল আর সুগার অব মিল্ক দিয়ে বাড়ি তুলল দোতালা। সম্বলের মধ্যে এক মাথা পাকা চুল।···বুঝলাম ঐটাই আসল মূলধন। তার পরেই এল এই পরচুলা আর দাড়ি। ছেলেবেলায় ফুটবল খেলে তিনটে দাঁত হারিয়েছিলাম। সেটাও এবার কাজে লেগে গেল। বাড়ি ফাঁদতে আর দেরি নেই। তারপর—

বাইরে জুতার শব্দ। চোখের নিমেষে মাধবের মুখ-চোখের বয়স হল পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচাত্তর। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন

গগনবাবু। নমস্কার করে বললেন—এই যে ডাক্তারবাবু, এসে পড়েছেন ? তারপর, রোগীর খবর ভাল তো ?

মাধব ডান হাতখানা আস্তে আস্তে উপরে তুলে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলল—স-ব-ই-ভ-গ-বা-নে-র ই-চ্ছা।



দারোয়ান

আমি হচ্ছি এক নাম-করা খবরের কাগজের সম্পাদক। আমার শোবার ঘরে খাটের পাশেই আছে একটা টেলিফোন। গভীর রাতে তোমরা যখন আরাম করে ঘুমোও, তখন আমার সাব-এডিটর হরবিলাসবাবু ঐ যন্ত্রটা বাজিয়ে প্রায়ই আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকেন।

সেদিনটা বোধ হয় রবিবার। রাত বারোটা কি একটা। ঘুমটা সবে জমে উঠেছে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল টেলিফোন। রিসিভারটা তুলে নিয়ে রুক্ষস্বরে বললাম, আপনার জ্বালায় ছুটির দিনেও একটু রেহাই নেই!

—বড্ড বিপদে পড়ে আপনাকে বিরক্ত করছি—

একি! হরবিলাস বাবুর গলাটা এমন মিহি এবং মিষ্টি হল কবে থেকে?

বললাম, আপনি কে জানতে পারি?

— আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার বড্ড বিপদ।

— কি বিপদ, বলুন ?

— আমার স্বামী আজ তিনদিন হল কোথায় চলে গেছেন। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। সেটা যাতে কাল ভোরেই—

—ও সব ব্যাপার অফিসে জানাবেন। এটা আমার বাড়ি।

মহিলাটি অত্যন্ত কাতর হয়ে বললেন, জানি। কিন্তু ওঁরা যে ছাপতে চাইছেন না। বলছেন জায়গা নেই।

কি আর করি ? হরবিলাসবাবুকে ডেকে জায়গা করে দিতে হল।

সকাল বেলা কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই বিজ্ঞাপনটার কথা মনে হল। "হারানো, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ" কলমের নীচের দিকে ছাপা হয়েছে—

আমি তোমার নামে শপথ করে বলছি, আর কোন দিন ও কথা মুখে আনব না। একবার শুধু ফিরে এসো। তোমার পায়ে পড়ি।

—হতভাগিনী অলকা।

দিন চারেক পরে। অফিসে বসে কাজ করছি। টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো !

—আমি অলকা। নমস্কার।

—ওঃ, নমস্কার। আপনার স্বামী ফিরে এসেছেন ?

—না, কি করি বলুন তো ?

—তাই তো। খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু—

মহিলাটি যেন অনেকখানি কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি। আর-একটা অনুরোধ করব?

—কি বলুন? আমি যতটা পারি নিশ্চয়ই করব।

দয়া করে একবার যদি আমার বাড়িতে আসেন, বড়ই উপকার হয়।

একজন ভদ্রমহিলা বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছেন। তা ছাড়া ব্যাপারটা সম্বন্ধে মনে মনে অনেকখানি কৌতূহলও ছিল। সুতরাং রাজী হলাম।

মস্ত বড় বাড়ি। মাধবী লতার ছাউনি-ঘেরা গেট। সামনে ফুলের বাগান; দুধার দিয়ে কাঁকর-বিছানো পথ। গেটের গায়ে পিতলের প্লেটে লেখা—বি কে. বসাক।

নামটা খুবই চেনা।

ভিতরে গাড়ি-বারান্দার নীচে আমার গাড়ি থামতেই দারোয়ান এসে উপরে বসবার ঘরে নিয়ে নিয়ে গেল। একেবারে আধুনিক ধরনে সাজানো বড়লোকের ড্রইংরুম। মিনিট তিনেক বসতেই একটি মহিলা এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, আপনিই কি—

—আমিই অলকা।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

—এটাই কি বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার বিজন বসাকের বাড়ি?

—তিনিই আমার স্বামী।

আমি, যাকে বলে, একেবারে হতভম্ব। ক-মিনিট তো কথাই বেরুল না। তারপর কোন রকমে বললাম, মিস্টার বসাক নিরুদ্দেশ! এ কেমন করে হল?

মহিলাটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই কথা বলবার জন্যই আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি। আমার আর কেউ নেই। যারা ছিল, তারাও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখ হল। বললাম, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।

অলকা দেবী বললেন, আপনাকে একটু উঠতে হবে।

অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে আমরা থামলাম। ঘরটা বন্ধ ছিল। উনি নিজে তালা খুলে আমাকে ভেতরে যেতে বললেন। ফাঁকা ঘর। আসবাবের মধ্যে একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। তার উপরে একটা রুপোর কৌটো এবং একটা কলকে। টেবিলের পাশে একখানা সাধারণ চেয়ার। অলকা দেবী কৌটোটা খুলে আমার সামনে ধরে বললেন, এটা কী চিনতে পারছেন?

খানিকক্ষণ দেখে বললাম, গাঁজা বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই বটে। আর এটা?

—ওটা তো কলকে।

—গাঁজার কলকে।

বললাম, এ সব এখানে কেন?

অলকা আর একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন, আমার স্বামী খেয়ে থাকেন।

আঁতকে উঠে বললাম, অ্যাঁ, বলেন কি! বসাক সাহেব গাঁজা খান! আপনি কি ক্ষেপেছেন নাকি!

নিঃশব্দে বসবার ঘরে ফিরে এসে অলকা দেবী বললেন, আপনাকে সব কথা খুলে বলছি।

তেরো বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের তিন দিন পরেই জানতে পারি যে আমার স্বামী গাঁজা খেয়ে থাকেন। মনে আছে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। অত বড় ঘরের ছেলে, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার, চাল-চলনে পুরো সাহেব— গাঁজার কলকের দম দিচ্ছেন,—দৃশ্যটা সইতে পারি নি। বিলাতে কোন্ এক সাধুর পাল্লায় পড়ে নাকি এটা ধরেছিলেন, আর ছাড়তে পারেন নি। পারেন নি বলি কেন, ছাড়তে চান নি। উনি বলেন, এত বড় আনন্দ নাকি দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। যতক্ষণ কলকে হাতে থাকে ওঁর মনে হয় উনি সশরীরে স্বর্গে আছেন।

অনুরোধ, অভিমান, ঝগড়া, রাগারাগি,—সবটাই করে দেখছি। কোন ফল হয় নি। এ লজ্জা আর এত বড় দুঃখ কাউকে জানানো যায় না। তেরো বছর ধরে কি করে দিন কেটেছে আমি বোঝাতে পারব না। আরো কত বছর হয়তো এমনি করেই কাটত, হঠাৎ একটা চরম কাণ্ড ঘটে গেল।

দিনটা ছিল আমার জন্মদিন। উৎসবের আয়োজন ছিল, আর সেই সঙ্গে একটা চায়ের আসর। কলকাতার অনেক

বিশিষ্ট লোক এসেছেন। মহিলাদের ভিড়ই বেশি। হঠাৎ ঐ ছোট ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি তরুণী কিসের তীব্র গন্ধে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। গন্ধের ব্যাপারটা আমি জানি,



আর কারুর তো জানা ছিল না! কিন্তু জানতে আর দেরি হল না। লোকজন, হৈচৈ, জল, পাখা, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি হট্টগোলের মধ্যে বেরিয়ে এলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ বসাক— গায়ে ফতুয়া, হাতে গাঁজার কলকে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, সর্বাঙ্গে উৎকট গন্ধ। মেয়েদের মধ্যে আরো দুচারজন ফিট হয়ে পড়ে গেল। পুরুষেরা কেউ দিলে গালাগালি, কেউ ডাকল ডাক্তার, আর কেউ ছুটল পুলিশ থানায়।

আর আমি ? মাথায় বোধ হয় খুন চেপে গিয়েছিল। তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম শোবার ঘরে। চিৎকার করে বললাম—"বল, কাকে চাই ? স্ত্রী না গাঁজার কলকে ? শেষ উত্তর দিতে হবে।"

তিনি কি একটা বোঝাতে গেলেন ; কিন্তু বারংবার আমি একই কথা বলে গেলাম—"বল, কোনটা চাই ?" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ; তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরে বেয়ারা একখানা চিঠি নিয়ে এল। ভেতরে এক টুকরো কাগজ। লেখা আছে—সব ছেড়ে যাচ্ছি, গাঁজা ছাড়তে পারব না।

তারপর তিন দিন ধরে বহু জায়গায় খোঁজ করে শেষটায় গভীর রাতে আপনার কাছে ফোন করেছিলাম।

অলকা দেবীকে সাহায্য করব, কথা দিয়েছিলাম। করেওছি অনেক কিছু। পুলিশে খবর দিয়েছি ; কোর্টের মারফত হুলিয়া বের করিয়েছি ; আর কাগজে কাগজে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। তাঁর ছবি দিয়ে সিনেমায় "স্লাইড্" দেওয়া হয়েছে—তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। কিন্তু কোন খবর পাওয়া যায় নি।

একেবারে হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা ; এমনি সময়ে এক ভাটিয়া ভদ্রলোকের একটা চিঠি এল। লিখেছেন—এলাহাবাদের কাছে মিঃ বসাকের মত একজন লোক দেখতে

পাওয়া গেছে। ভদ্রলোক তাঁর মক্কেল। আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু সাড়া পান নি।

মিসেস বসাকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম ঐ দিনই এলাহাবাদ যেতে হবে। শহরের ঠিক বাইরেই আমার পিসেমশাই আছেন। জমিদার লোক। মস্ত বাড়ি ; অনেক লোকজন। পিসীমারাও আছেন। ওখানেই ওঠা যাবে, অলকা দেবীর অসুবিধা হবে না।

পিসীমাকে লিখে দিলাম—একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে তাঁরই কোন জরুরী কাজে এলাহাবাদ যাচ্ছি।

স্টেশনে পৌঁছে দেখি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে পিসতুতো ভাই সুব্রত আর বোন মঞ্জু। অলকা দেবীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

কয়েক মাইল গিয়ে পিসেমশায়ের প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকে গাড়ি ঢুকল। দারোয়ান এসে দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সকলের শেষে নামলেন অলকা দেবী। এক পা ফুটবোর্ডের উপর, এক পা মাটিতে—পাশের দিকে একবার তাকিয়েই মিসেস বসাক হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

মঞ্জু ছুটে এসে ধরে না ফেললে বোধ হয় মাথাটাই ফেটে যেত। ধরাধরি করে নিচেই একটা ঘরে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার এলেন। জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল। এই অবসরে আমি ওঁর মোটামুটি ইতিহাসটা সবাইকে খুলে বললাম।

ঘণ্টা খানেক পরে অলকা দেবী চোখ খুললেন। পিসীমা

পাশেই ছিলেন ; বললেন এখন কেমন লাগছে মা ?

অলকা দেবী ক্ষীণ স্বরে বললেন, ভাল।

—তা হলেও তুমি শুয়ে থাকো। এখন উঠো না। মঞ্জু খানিকটা দুধ নিয়ে এল। কয়েক চামচ খাইয়ে দিয়ে পিসীমা বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই মা। আমরা পঁচিশ জন লোক ঠিক করেছি। তারা চারদিকে মিঃ বসাককে খুঁজতে যাচ্ছে।

—খুঁজবার দরকার নেই।

—কেন ?

—তাঁকে পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে! কোথায় ? বলে পিসীমা ব্যস্ত হয়ে আমাদের ডেকে পাঠালেন।

ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বসাক সাহেব কোথায় আছেন অলকা দেবী ?

তিনি জবাব দিলেন না। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পিসীমা আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বললেন, বল মা কোথায় দেখলে ?

—আপনার দারোয়ান—বলে অলকা দেবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

* * *

পরদিনই ফিরব আশা করেছিলাম, কিন্তু পিসীমা ছাড়লেন না। দিন তিনেক সবাইকে থেকে যেতে হল।

খাবার দিন বসবার ঘরে বসে জটলা হচ্ছে। মিস্টার বসাকও ছিলেন। বললাম, হঠাৎ গা-ঢাকা না হয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এত কাজ থাকতে হঠাৎ দারোয়ান হবার শখ হল কেন বলতে পারেন, মিস্টার বসাক?

বসাক সাহেব বললেন, শখ নয়, প্রয়োজন!

—কি রকম?

—দেখুন, এ কথা আমি ভাল করেই জানি, ঐ যে জিনিসটা, যা না হলে আমার একদিনও চলে না, ভদ্রসমাজে ওটা অচল। তাই এমন একটা পেশা বেছে নিতে হল, যেখানে ওটা অবাধে চলতে পারে। শহরে থাকলে লোকে চিনে ফেলে। তারপর আপনাদের বিজ্ঞাপনের জ্বালায় চেহারা বদলেও লুকিয়ে থাকা দায়। তাই শহর ছেড়ে এলাম শহরতলীতে। জমিদারের বাড়ি দেখে ঢুকে পড়লাম। বললাম, দারোয়ান রাখবেন? মাইনে চাই নে। শুধু দুটো খেতে দেবেন, আর এক কলকে ঐ—! ওঁরা তো বেজায় খুশী।

পিসেমশাই বললেন, কিন্তু আমাকে যে অপরাধী করে রেখে গেলেন—

—কিছু না, কিছু না। আপনি আমার অন্নদাতা। তার চেয়েও বেশি প্রাণদাতা। কেননা, ঐ বস্তুটাই হচ্ছে, যাকে বলে, আমার প্রাণ!···

তার পর অলকা দেবীর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, কিন্তু এখন থেকে প্রাণটা বুঝি বেঘোরে—

অলকা দেবী বললেন, ভয় নেই। প্রাণটা বেঘোরে যাবে

না। বলে শাড়ির আড়াল থেকে কলকেটা বের করে ওঁর হাতে দিলেন।

মিঃ বসাক এমন ভাবে দু হাত পেতে সেটাকে তুলে নিলেন যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছেন।

সকলের মিলিত হাসিতে ঘর ভরে উঠল।



টু-লেট্

নতুন বাড়িতে এসে প্রথম রাতটা ঘুম আসছিল না। এ-পাশ ও-পাশ করে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ধারালো বিকট শব্দে ঘুমটা যেন ঝাঁকানি খেয়ে ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। শব্দটা আসছিল পাশের বাড়ির দিক থেকে। কোন রকমে কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দরজা খোলাই ছিল। ঢুকেই ডান দিকে একটা ছোট ঘর। আর মাঝখানে কম্বলের উপর বসে একজন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী-গোছের লোক বেপরোয়া চিৎকার করছে। গলা চিরে রক্ত পড়ছে না এইটাই আশ্চর্য। জানি না সে কি উৎকট ব্যাধি

যার তাড়নায় মানুষকে এমন করে আর্তনাদ করতে হয়। সমস্ত মুখ কুঁচকে আসছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে, আর মাথাটা মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়ে যাবে। কি করব ভাবছি, এমন সময় একজন কে এগিয়ে এল।

—আপনার কি চাই? ভয়ে ভয়ে বললাম, উনি অমন করছেন কেন? কি হয়েছে?

—কিছু হয় নি। উনি সুর-সাধনা করছেন।

—সুর-সাধনা করছেন!

—হ্যাঁ; উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ওস্তাদ সচ্চিদানন্দ বটব্যাল।

তারপর বেলা যেমন বাড়ল, নানা জাতের, নানা বয়সের কত সব শিষ্য এবং শিষ্যা এসে জড় হল ওস্তাদজির বৈঠকখানায়। কেউ এল ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ মোটর হাঁকিয়ে, কেউ বা রিকশায়। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই শুরু হল—"আলাপ", অর্থাৎ সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁদে, কঁকিয়ে গর্জে উঠল! সে কি সুরের মূর্ছনা! মনে হল আর কিছুক্ষণ শুনলেই মাথায় খুন চেপে যাবে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সরে এলাম।

মা এসে বললেন—জিনিস-পত্তর আর খুলে কাজ নেই। আজই অন্য বাড়ি ছাখ।

ছোট বোন বললে—মনখানেক তুলো কিনে আন মেজদা। যতক্ষণ আছি, বেশ করে না ঠাসলে, কানের পরদা ফেটে যাবে।

বুঝলাম সবই। কিন্তু কলকাতার শহরে বাড়ি খোঁজা। তার চেয়ে অনেক সহজ মেক্সিকোর জঙ্গলে সোনা খুঁজে

বের করা। ভাগ্যিস পিসতুতো ভাই সমরেশ—ক্যালকাটা পুলিশের মস্ত চাঁই। তারই চেষ্টায় এবং ছ মাসে তিন জোড়া জুতোর তলা ক্ষয় করে এই সাড়ে তিন খানা ঘর জোটানো গিয়েছিল। এবার আবার কোথায় যাই?

সেই দিনই সমরেশের শরণ নিলাম। সব শুনে সে বললে—কি করবে বল? মনে করে নাও, তোমার বাড়ির পাশে জেসোপ কোম্পানি চব্বিশ ঘণ্টা লোহা পিটছে।

আমি বললাম—আপত্তি নেই। বাড়ির আরেক পাশে যদি টাটা এসে ছত্রিশ ঘণ্টা ইস্পাত ঠোকে, তাও সইব। কিন্তু সচ্চিদানন্দের সুর-সাধনা? উঃ! সে একেবারেই অসহ্য।

সমরেশ কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বললে—আচ্ছা দেখি কি করা যায়।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। কি করে কাটল, বোঝাতে চাই না, চাইলেও পারব না। দরজা জানালা বন্ধ। তারই ভেতর দিয়ে ফুঁড়ে আসছে সুরের জিমন্যাস্টিক আর তালের খচমচ। হঠাৎ সে দিন মনে হল যেন একটা বেসুরো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখলাম, হ্যাঁ, একটা নতুন কিছু বটে। বটব্যালের বাড়ির সামনে এক মস্ত বড় ভিড়—কম করেও জন পঞ্চাশেক লোক।

উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় তাদের বোঝাচ্ছেন—এক শ বার বলছি মশাই, এটা আমার নিজের বসত বাড়ি। তিন পুরুষ ধরে ছেলেপিলে নিয়ে বাস করছি, আর আপনারা বলছেন, ভাড়া দেবো? কেন? কোন দুঃখে।



ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বললে—ভাড়া দেবেন না তো এতগুলো "টু-লেট" লাগিয়ে কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন ?

বটব্যাল একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন,—টু-লেট ! আমার বাড়ির সামনে টু-লেট ! আপনি বলছেন কি ?

দেখা গেল, বলছেন ওঁরা ঠিকই, বাড়ির গায়ে গেটের সামনে তিন-চার খানা ছাপানো টু-লেট। তাতে লেখা আছে— "ভেতরে অনুসন্ধান করুন।" একটা চাকর গিয়ে সবগুলো খুলে নিয়ে এল। বটব্যাল কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকে হঠাৎ রুখে উঠলেন—এ সব চক্রান্ত ! আমি পুলিসে যাব— আমি দেখে নেব—

শিষ্যেরা এসে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সেদিনকার সুর-সাধনা আর তেমন করে জমল না। পরদিন সকালে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। বেলা তখন আটটাও বাজে নি। সরু গলিটা একেবারে লোকে লোকারণ্য। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সবারই লক্ষ্য বটব্যালের বাড়ি। পুলিশ এসে লোকগুলোকে লাইনে দাঁড় করাতে লাগল— সিনেমার টিকেট ঘরের সামনে যেমন করে কিউ দিতে হয়। ওস্তাদের দরজা বন্ধ। ভিড়ের মধ্যে তখন ভয়ানক সোরগোল চলছে। কেউ বলছে দরজা ভেঙে ফেল। কেউ হাঁকছে—কে আছেন, বেরিয়ে আসুন, মশাই !

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর চাকর এসে দরজা খুলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোজন লোক ভেতরে ঢুকে গেল।

বটব্যাল সামনেই ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন—কি চান আপনারা ?

সকলে এক সঙ্গে বললে—বাড়ি-ভাড়া।

বটব্যাল যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন—দেখুন, এ বাড়িতে আমি বাস করি। এটা যে ভাড়া দেওয়া হবে, একথা তো আমি কাউকেই বলি নি।

সঙ্গে সঙ্গে কার গায়ের উপর এসে পড়ল কতগুলো কাগজ, এবং তিন-চারজন গর্জে উঠল—এসব কি তাহলে তামাসা ?

বটব্যাল পড়ে দেখলেন, এগুলোও ছাপানো টু-লেট—কালকেরগুলো থেকে একটু ছোট। কিন্তু এতে বাড়ির নম্বর দেওয়া আছে; আর বলা আছে যে—ভাড়ার জন্যে স্বয়ং বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়েছে শহরময়,—শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ, আর বেলেঘাটা থেকে বড়বাজার,—লাইট পোস্টে, বাড়ির দেওয়ালে, ইস্কুল-কলেজের নোটিশ বোর্ডে। বটব্যাল দেখলেন, চটলে সুবিধা হবে না; ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন—আপনাদের নাম-ধাম সব দিয়ে যান, পরে খবর দেব।

প্রথমে এগিয়ে এলেন একজন, তার দেশ বোধহয় মাদ্রাজ। বটব্যাল খাতা-পেন্সিল নিয়ে বললেন—আপনার নাম ?

—ভেঙ্কটরাম আচারিয়া।

বটব্যাল লিখতে লিখতে পড়লেন—কটমটরাম আচারিয়া। তারপর ?—

—No ; No ; Not কটমটরাম। ভেঙ্কটরাম, My name is ভেঙ্কটরাম।

—ঐ একই হল মশাই। যে ভেঙ্কট, সে-ই কটমট। তারপর ?—



তুনম্বর এলেন এক মাড়োয়ারী ; নাম বললেন, গঙ্গাধরলাল বক্‌রিওয়ালা। তার পর বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ভাটিয়া, উড়িয়া··· বটব্যালের খাতা ভরে উঠল।

বাইরে তখন তুমুল কাণ্ড চলছে। ভীষণ ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি। সবাই একসঙ্গে ঢুকতে চায়। বাড়ি বুঝি ভেঙেই পড়ে। অগত্যা ওস্তাদজী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং জোড় হাত করে কি একটা বলতেও গেলেন, কিন্তু জনতার হুঙ্কারে কিছু শোনা গেল না। জনকয়েক এগিয়ে তার একটা

হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। বটব্যাল হাঁকলেন—পুলিশ! পুলিশ!

কোথায় পুলিশ? শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এসে দাঁড়াল; কিন্তু কি করবে ভেবে পেল না। এমনি যখন অবস্থা তখন ঘটল এক খণ্ডপ্রলয়। হঠাৎ সেই ক্ষেপে-ওঠা লোকগুলো, "বাবা গো মাগো" বলে এ পড়ে ওর ঘাড়ে, ও পড়ে এর ঘাড়ে। কি ব্যাপার? দেখলাম, বটব্যাল-গিন্নী দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বালতির পর বালতি গোবর-গোলা জল নিয়ে ঢেলে চলেছেন রাস্তায়। ওপরে চেয়েছ কি মুখের উপর এক বালতি। এত বড় যে জনতা, একেবারে কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা। বড়বাজারে গিয়েছিলাম, কি একটা কাজে। দেখলাম, একজন লোক প্রত্যেক গ্যাস-পোস্ট থেকে কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছে। এ কি? এ যে আমাদের সচ্চিদানন্দ!

—ও কি করছেন, ওস্তাদজী?

বটব্যালের চোখ লাল। বললেন—পরশুরামের কথা জানেন তো? পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। আমি কলকাতা শহরকে বিজ্ঞাপনশূন্য করব।

দিন কয়েক আর কোন উপদ্রব হল না। মাঝে মাঝে দু-চার জন লোক আসে; কড়া নাড়ে, চাকরে দরজা খুলে জানিয়ে দেয় বাড়ি ভাড়া নেই। তারা চলে যায়। মনে হল ওস্তাদের ফাঁড়া এবার কাটল। সুর-সাধনা কিছু দিন বন্ধ থেকে আবার চলতে শুরু হয়েছে। হঠাৎ আবার কি হল?

রবিবার সকাল আটটা নাগাদ বটব্যালের বাড়ির সামনে দলে দলে কাতারে কাতারে লোক জড় হতে লাগল। প্রায় সকলের হাতেই একটা করে খবরের কাগজ। আবার সেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি—ও মশাই, ও মিস্টার বটব্যাল, বাড়িটা একবার দেখতে চাই।

ওস্তাদজীর একজন শিষ্য এসে বললেন—এ বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে।

আরে মশাই, আজ সকালে কাগজে বেরিয়েছে, এরি মধ্যে হয়ে গেল? ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পেলেন না?—বলে কয়েকজনে তাদের কাগজখানা শিষ্যকে দেখালেন।

শিষ্য অবাক হয়ে দেখলেন—দস্তুরমত বাড়ি-ভাড়ার বিজ্ঞাপন। শুধু বাড়ির নম্বর নয়, বাড়িওয়ালা বটব্যালের নাম পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। একখানা কাগজ নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বাইরের ভিড় জোয়ারের জলের মত ফুলে উঠতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে দুখানা ঘোড়ার গাড়ি বহু কষ্টে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এসে দাঁড়াল ওস্তাদজীর গেটের সামনে। তার উপর চাপানো হল বাক্স, বিছানা, টিনের সুটকেস, দড়িবাঁধা আলনা, কাপড়ে-জড়ানো মাদুর আর নানা আকারের হাঁড়ি-কলসি। একটু পরেই তানপুরা কাঁধে নেমে এলেন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বটব্যাল এবং তার পেছনে ছেলের হাত ধরে বটব্যাল-গৃহিণী।

দু-চার জনে জিজ্ঞেস করলেন—এ বাড়ি ভাড়া দেবেন নাকি ?

—না। ভাড়া নয়, একেবারেই দিয়ে যাচ্ছি। তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে দিলাম। যাও—তোমরা বেশ করে ভোগ কর।—বটব্যালের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

একজন—বোধ হয় চেনা লোক—জিজ্ঞেস করলে—এ কি! ওস্তাদজী কোথায় যাচ্ছেন ?

ওস্তাদজি দাঁত কড়মড় করে বললেন—চুলোয়।

—আরে, এসো এসো, সমরেশ যে ?

সমরেশ পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে বললে—বটব্যাল ব্যাটা চলে গেছে তো ?

—হ্যাঁ; সে তো পরশু।

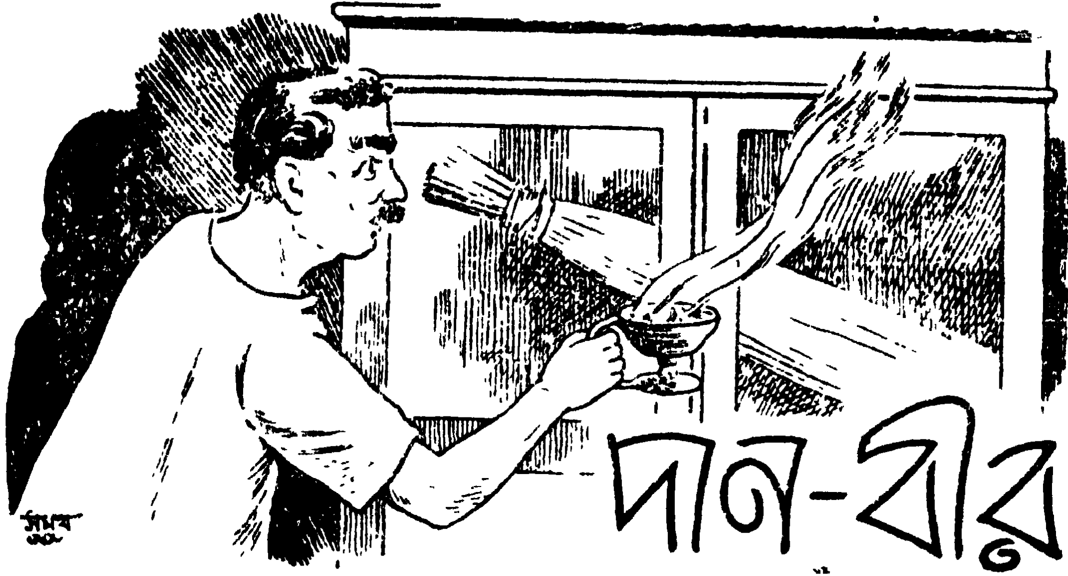
—যাক। এবার তাহলে বিলটা দিয়ে দাও। ন টাকা তের আনা।···বলে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কিসের বিল ?

—পাঁচশখানা টু-লেট ছাপাবার খরচ আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন একদিন।

—ও-ও; এসব তাহলে তোমার কাণ্ড ?

সমরেশ কথা বলল না। হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।



দান-বীর

ট্যাংরাখোলার বাজারে একখানা ছোট-খাটো "বাজে মালের" দোকান। বাপের আমল থেকে ঐটুকুই গণেশ পালের সম্বল। কোন রকমে সংসার চলে; অর্থাৎ চলে না বললেই চলে। তখন যুদ্ধের বাজার। কাপড়, চাল, কেরোসিন জোটাতেই প্রাণান্ত। হঠাৎ একদিন শোনা গেল—মিলিটারি আসছে। সত্যিই মিলিটারি এল। নদীর পারের সমস্তটা মাঠ জুড়ে আমেরিকানদের ছাউনি পড়ল। তাদের রাক্ষুসে চাহিদা মেটাবার জন্যে দালাল, ফড়ে আর ঠিকাদারে বাজার ছেয়ে গেল। যত ছিল বেকার লোক, তাস পিটে আর তামাক টেনে দিন যেত, কাজ জুটে গেল সবাকার। সবারই হাতে চকচকে নতুন নোট।

গণেশও গিয়ে ধরল ওদের বড়বাবুকে—একটা কনট্রাকটারি চাই।

"তুমি পারবে? পুঁজি আছে কিছু?"—বড়বাবু হেসে বললেন।

"আজ্ঞে, পুঁজি অতি সামান্যই। ছোট-খাটো অর্ডার পেলে দিতে পারব।"

"ছোট-খাটো আর কীই বা আছে? আচ্ছা, ঝ্যাটার অর্ডারটা নিয়ে যাও। এক হাজার ঝ্যাটা চাই, সাতদিনের মধ্যে; প্রত্যেকটা আড়াই সের।"

ঝাঁটা! গণেশ পালের মনটা দমে গেল। লোকে বলবে 'ঝ্যাটাওয়ালা'!

কিন্তু টাকা যখন চাই, অত বাছ-বিচার করলে চলে না। অনেক ভেবে গণেশ রাজী হল। নৌকো, গরুর গাড়ি আর লোকের মাথায় চড়ে দুনিয়ার ঝাঁটা এসে জড় হল তার বৈঠকখানায়। ছেলেরা নাক সিটকায়; গিন্নী তো রেগেই আগুন—'খেতে না জোটে ভিক্ষে কর। এ সব অলক্ষুণে কাণ্ড কেন বাপু?" দত্ত মশাই মুরুব্বি লোক; বাড়ি বয়ে বলে গেলেন, "কি হে গণেশ, শেষকালে তোমার কপালে জুটলো ঝ্যাটা?"

যে যাই বলুক, ঝাঁটার থেকেই গণেশের কপাল ফিরে গেল। ঝাঁটার পরে ঝুড়ি, এবং তার পর বছর না যেতেই টাকাও আসতে লাগল ঝুড়ি ঝুড়ি। গণেশ পালের ব্যাঙ্কের জমা লাখ ছাপিয়ে উঠল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ট্যাংরাখোলার বাজারে সবচেয়ে বড় আড়ত গণেশ পালের। জেলার সদরে বাড়ি উঠেছে

তিনতলা। এখন সেখানেই সে থাকে। বাইরেটা তেমনি আছে। সেই আধ-ময়লা ফতুয়াটা এখন ঝুলে একটু বেড়েছে। গণেশ তার নাম দিয়েছে, হাফ-পাঞ্জাবি। সাবেকী আমলের বৈঠকখানা। ঘরজোড়া তক্তপোশ; তার ওপরে শীতলপাটি। ঠিক সামনেটায় একটা কাঁচের আলমারি, তার ভেতরে একখানা মস্ত বড় ঝাঁটা। সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ নিজ হাতে ধুপ-ধুনো দেয় সকাল-সন্ধ্যা। কেউ যদি প্রশ্ন করে—"আলমারিতে ঝ্যাটা কেন?" গণেশ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "আজ্ঞে, ঐ রূপেই মা-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন।" ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে পড়ে। বড় ছেলে তো কথাই কয় না বাপের সঙ্গে। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে - "বাবা, ঝ্যাঁটাটা সরিয়ে ফেল। লোকে হাসাহাসি করে।"

গণেশ জিভ কেটে বলে—"সর্বনাশ! বলিস্ কি তোরা?"

টাকা যেমন বাড়ল, তার সঙ্গে বেড়ে চলল উমেদার ও দাবিদারের দল। পাড়ায় ঘটা করে সার্বজনীন দুর্গা পূজো হবে! গণেশের নামে চাঁদা পড়ল পাঁচ-শ টাকা। পূজো-কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিজেই এলেন আদায় করতে। অনেক আদর-আত্তি, খাতির-সমাদরের সঙ্গে গণেশ এগিয়ে দিল একখানা পাঁচ টাকার নোট। প্রেসিডেণ্ট চোখ রাঙিয়ে বললেন —"আমাদের সঙ্গে তামাসা করছেন?"

গণেশ জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে—"ছি-ছি ছি! আপনারা হলেন মানী লোক। তামাসা করা কি আমার সাজে?"

পূজো-কমিটি রেগে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। এমনি করেই আর একদিন ফিরে গেল কাত্যায়নী থিয়েট্রিকাল্ পার্টির ম্যানেজার। গণেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিল পাঁচ সিকে। মেয়েদের মাইনর স্কুলকে হাই স্কুলে দাঁড় করাতে হবে। হেড মিস্ট্রেস্ সুমিতা দেবী এসে সাহায্য চাইলেন। পাল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। একবার বসে, তিনবার দাঁড়িয়ে, পাঁচ বার নমস্কার করে মাথা চুলকে, বের করল দশ টাকার একটা নোট। সুমিতা চোখ কপালে তুলে বললেন—"এ কি করছেন? আমি যে হাজার খানেক টাকার আশা নিয়ে এসেছিলাম পাল মশাই!"

গণেশ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল—"আমি নগণ্য লোক; আমাকে অমন করে ঠাট্টা করলে বড্ড লজ্জা পাই।"

এর পর থেকে গণেশের নামের আগে-পিছে পাড়ার ছেলেরা যে সব বিশেষণ বসাতে লাগল, সেগুলো এখানে বলা চলে না।

গণেশের পিসতুতো শ্যালক—ভুজঙ্গভূষণ। ভারী ভাব দু জনের। বয়সের তফাত অনেক—ছাপ্পান্ন আর ছাব্বিশ। কিন্তু মনের কথা চলত তারি সঙ্গে। ভুজঙ্গ ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টার। নানা জায়গায় ঘুরে টাটকা আর মুখরোচক খবর তৈরি করাই ছিল তার পেশা। রিপোর্টার কথাটা সে পছন্দ করত না, নিজেকে বলত জার্নালিস্ট। মাঝে মাঝে গণেশের বাড়ি এলে বেশ কিছুদিন আড্ডা জমত।

সেবার শহরে লাগল ভোট-যুদ্ধ। আইন-সভার সভ্য

নির্বাচন হবে। একদিকে দাঁড়িয়েছেন জেল-ফেরত দেশসেবক জগৎনারায়ণ। আর একদিকে জবরদস্ত জমিদার শিবেশ চৌধুরী। গালাগালি, লাঠালাঠি আর গরম বক্তৃতায় শহর একেবারে সরগরম। এমন সময় ভুজঙ্গ এসে হাজির।

"কি খবর? অনেক কাল যে দেখা নেই!"—গণেশ জিজ্ঞেস করল।

—"কত দেশ ঘুরতে হয় দাদা! জার্নালিস্ট মানুষ; এক জায়গায় থাকলে কি চলে?"

—"তার পর হঠাৎ কি মতলবে?"

ভুজঙ্গ অবাক হয়ে গেল—"সে কি! ইলেক্‌শন্ হচ্ছে, খবর রাখেন না?"

পরদিন টাউন হলে বিরাট সভা। জগৎনারায়ণ বক্তৃতা করবেন। ভুজঙ্গ একরকম জোর করেই গণেশকে ধরে নিয়ে গেল।

মঞ্চের উপর আগাগোড়া খদ্দর-মোড়া জগৎনারায়ণ বসে আছেন, চারদিক থেকে ঘিরে আছে ভক্তের দল। শহরের গণ্যমান্য লোক কেউ বাকী নেই। দর্শকদের মধ্যে গণেশ আছে সামনের দিকে। ভুজঙ্গের কাছাকাছি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্লে, "ওহে ভুজঙ্গ, এ যে দেখছি আমাদের সেই পাগলা জগা! ও আবার জগৎনারায়ণ হল কবে?"

অনেকে কটমট করে তাকাল। ভুজঙ্গ ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ফিসফিস করে বললে—"চুপ।"

গণেশ গজরাতে লাগল—"আরে রাখো তোমার ইয়ে!

ওর কীর্তি আমার তো আর অজানা নেই! থার্ড ক্লাসে দু-দু-বার ফেল করবার পর হেডমাস্টার তাড়িয়ে দিলেন। তার পর গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে গেল জেলে। ওই বুঝি এখন তোমাদের নেতা?"

পাশ থেকে একটি ছোকরা ধমকে উঠল "চুপ করুন মশাই!"

এক বোঝা ফুলের মালা গলা থেকে নামিয়ে জগৎনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। হাততালিতে, মনে হল সমস্ত হলটা বুঝি ফেটে পড়বে। ঘণ্টা খানেক, যাকে বলে জ্বালাময়ী বক্তৃতার আগুন ছড়িয়ে, শেষের দিকে বললেন—

"বন্ধুগণ! আমি একজন নগণ্য দেশ-সেবক। শিবেশ বাবুর মত না আছে অর্থ, না আছে খেতাব, না আছে সরকারী সার্টিফিকেটের জোর। শুধু একখানা ছোট্ট সার্টিফিকেট আমার সম্বল। সেটুকু আমি সবসময় সাথে করে নিয়ে বেড়াই। সেইটাই আজ আপনাদের সামনে খুলে দেখাতে চাই। দেখে যদি আপনারা মনে করেন আমার যোগ্যতা আছে দেশসেবার, তা হলে ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন যোগ্যতা নেই, ভোট চাই না।—"

এই বলে জগৎনারায়ণ পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভক্ত তার পিঠের কাপড়টা তুলে ধরল—একটা কাটা দাগ। ভক্ত সংক্ষেপে বললে—"পুলিশের বুট, দেশসেবার পুরস্কার।"

গণেশ আঁতকে উঠল—"অ্যাঁ! বলে কি? পুলিশের বুট! একেবারে রাতকে দিন! ও তো সেই লিচুগাছ থেকে—"

তুমুল হাততালিতে গণেশের কথা ডুবে গেল।

ভুজঙ্গ বাড়ি ফিরে দেখল গণেশ অন্ধকার ঘরে বসে তামাক টানছে।

—"কি দাদা, আলোটাও জ্বালতে পারেন নি?"

গণেশ জবাব দিল না। একমনে অনেকক্ষণ তামাক টেনে আস্তে আস্তে বললে, "বুঝলে ভুজঙ্গ, ভেবে দেখলাম জগার রাস্তা ধরলেই ভাল হত। একেই বলে কপাল। টাকাপয়সা দিয়ে কি হবে? দেখলে একবার মালা আর হাততালির বহরটা?"

ভুজঙ্গ চোখের কোণে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, "কেন, লোভ হচ্ছে নাকি আপনার?"

—"আরে, লোভ হলেই হল? ও সব কপালে থাকা চাই। নইলে জগা ব্যাটা স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে কী মালা আর হাততালিটাই পেলে!"

গণেশের বুকের ভেতর থেকে একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল! ভুজঙ্গ একবার চেয়ে দেখল, আড়চোখে। দু-একবার মাথা নাড়লে, কিন্তু কথা বললে না।

দিন চার-পাঁচ পরে, সকালবেলা গণেশ কাজে যাবার আয়োজন করছে, একখানা খবর-কাগজ হাতে ছুটে এল তার মেয়ে সবিতা।

—"বাবা! বাবা!"

—"কি রে?"

—"এত টাকা দিয়েছ তুমি! কই, আমাদের তো কিচ্ছু বল নি!"

—"কোথায়, কিসের টাকা ?"

—"এখনও বুঝি লুকোচ্ছ ? এই দেখ না, কাগজে বেরিয়েছে।"

—গণেশ ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি বেরিয়েছে, পড় তো।"

সবিতা পড়ে গেল—"আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীগণেশচন্দ্র পাল নিজ শহরে একটি মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

গণেশ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল একদল ছেলে। একজন হেঁকে বলল, "গণেশ পা—লকি"—আর সবাই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, "জয়।" তার পর সবাই মিলে গণেশকে ঠেলে তুলল কাঁধের উপর। গণেশ বেচারী তো ভয়ে অস্থির—"আহা, কর কি! কর কি! পড়ে মরব যে—!"

কে শোনে কার কথা!

ছেলেদের পেছনে এলেন বড়দের দল।

—"সাবাস, সাবাস।"

—"খুব চালটা চেলেছ ভায়া!"

—"পেটে পেটে এতও তোমার ছিল!"

—"আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন আপনি—শহর আজ ধন্য হল আপনার মতন সন্তানকে বুকে ধরে।"—ইত্যাদি প্রশংসার বান ডেকে গেল। গণেশ কিছু বলবার সুযোগ পেল না, শুধু তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

এমনি করে চলল সারাদিন। বিকেলে এলেন এস্. ডি. ও। বললেন—"আপনার অনারে, মানে সম্মানে, আমরা একটা সভার আয়োজন করেছি। একটু কষ্ট করে যেতে হবে, এই টাউন হলে।"

গণেশ জানলা দিয়ে দেখল বাইরে লোকে লোকারণ্য।

—"এত লোক কেন?"

—"ও কিছু না, একটুখানি প্রসেশন।"

গণেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "আমাকে মাপ করবেন স্যর্! মিটিংয়ে গেলে আমার নিশ্চয়ই হার্টফেল্ করবে। ও আমি পারব না"—বলে এক ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। ভুজঙ্গের সঙ্গে দেখা। একেবারে ফেটে পড়ল গণেশ—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এ সব কী হচ্ছে?" ভুজঙ্গ শান্তভাবে জবাব দিল, "মাথা গরম করবেন না দাদা, এবার কপাল খুলল আপনার।"

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গণেশকে মিটিংয়ে যেতে রাজি করান হল।

মেয়ে পরিয়ে দিল গরদের জামা-চাদর। ভুজঙ্গ দিলে প্রথম মালা; হেসে বলল, "এই তো কেবল শুরু। আর এই নিন আপনার বক্তৃতা। সবার বলা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বেন।"—বলে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল হাতে।

সে কি মিটিং! টাউন হল ভেঙে পড়ে আর কি! জানলার উপর পর্যন্ত লোক বোঝাই। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছেন গণেশ পাল। মালায় ঘাড়ে-গর্দানে একাকার। ঢেকে গেছে

নাক পর্যন্ত। গণেশ অতি কষ্টে ঘাড় সোজা করে নাক তুলে বসে আছে। আর একটু হলে দম আটকে যাবে। জগার উপর আর হিংসে নেই। তবুও কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব।

শুরু হল বক্তৃতা। কেউ বললেন, দানবীর, কেউ বললেন দাতাকর্ণ। প্রবীণ উকিল মহীতোষ বাবু বললেন—"সব চেয়ে



বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যাঁর ডান হাত দান করে কিন্তু বাঁ হাত জানতে পায় না। আমাদের গণেশ আজ সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন।"

সকলের শেষে গণেশকে জবাব দিতে হল। মালার বোঝা নামিয়ে কোন রকমে পড়ে গেল ভুজঙ্গের সেই কাগজখানা। কান-ফাটানো হাততালির মধ্যে শেষ হল বিরাট সভা। এক-গাড়ি ফুলের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরল গণেশ।

হপ্তা খানেক কেটে গেছে। লোকজন এবার পাতলা হয়ে

এসেছে। এমন সময় একদিন দেখা দিলেন হেডমিস্ট্রেস্ সুমিতা দেবী আর তাঁর সঙ্গে ইস্কুল-কমিটির আরও দু-এক জন। আর এক দফা গুণগানের পর সুমিতা বললেন, "আমাদের টাকাটা"—

গণেশ আকাশ থেকে পড়ল, "কিসের টাকা ?"

—"আজ্ঞে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা, যেটা আপনি ইস্কুলের জন্য দান করেছেন !"

ভুজঙ্গ বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গণেশ বলল, "এঁরা বলছেন কি, ভুজঙ্গ ? আমি নাকি পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছি ? শোন কথা !"

ভুজঙ্গ চেয়ারটা টেনে একটু এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সুমিতার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কথা বেরুল না। ইস্কুল-কমিটির ভবেশ বাবু বললেন, "আপনার কথাই বরং আমরা বুঝতে পারছি না। কে না জানে উনি ইস্কুলের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন। খবর-কাগজে বেরিয়েছে। ঘটা করে মস্ত বড় সভা ডেকে ওঁকে মানপত্র পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আর এখন বলছেন—"

ভুজঙ্গ ধীরভাবে বলল, "সবই ঠিক। কিন্তু সে সম্বন্ধে উনি কি বলেছেন সেটা আপনারা শুনেছেন কি ?"

—"শুনেছি বই কি ! ওঁর বক্তৃতাও শুনেছি।"

ভুজঙ্গ পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বলল, "এই দেখুন সেই বক্তৃতার রিপোর্ট। দেখুন ঠিক আছে কিনা ?"

সুমিতা দেবী কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ—এইটেই তো মনে হচ্ছে।"

"—আচ্ছা, তাহলে শুনুন, আমি পড়ে যাচ্ছি", বলে ভুজঙ্গ রিপোর্টটা পড়ে গেল।

"বন্ধুগণ, আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেখালেন, আমি তার একেবারেই যোগ্য নই। এমন কিছুই আমি করি নি যার জন্যে আপনাদের কোন প্রশংসা দাবি করতে পারি। এ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং ছিল না।

"আপনারা আমাকে কেউ বলেছেন, দান-বীর, কেউ বলেছেন, দাতাকর্ণ। শুনে যে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ে। আপনারা প্রচার করেছেন আমি মস্ত বড় দান করেছি। ভুল, সব ভুল। আমার সাধ্য কি দান করি? সে সৌভাগ্য কোথায়? সে সঙ্গতিই বা কই! আমার মত ক্ষুদ্র লোকের কি দানের স্পর্ধা সাজে? তবু নিতান্তই বিনা কারণে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তার জন্যে শত কোটি ধন্যবাদ।"

পড়া থামিয়ে ভুজঙ্গ বললে, "আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা মেতে উঠলেও দানের কথা উনি স্রেফ অস্বীকার করে গেছেন। তাই নয় কি?"

সুমিতা ও তার সঙ্গীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন, জবাব খুঁজে পেলেন না। সত্যিই তো। এ কথাগুলোকে বিনয় মনে করে তাঁরা কত হাততালিই না দিয়েছিলেন! তখন কে জানত এর এ রকম একটা নিদারুণ মানেও হতে পারে!

আলনার উপরে মালাগুলো তখনও একেবারে শুকোয় নি। সেই দিকে চেয়ে গণেশ পাল বলল, "কিন্তু ওরা যদি মামলা করে ?"

"মামলা !"—ভুজঙ্গ হো হো করে হেসে উঠল। "এ আপনার বিজনেস্ নয় দাদা, এর নাম জার্নালিজম্।"



অ্যাক্সিডেন্ট

—১—

ডাউন মথুরা এক্সপ্রেস ঘণ্টা চারেক লেট। হাওড়া পৌঁছবার কথা ভোরবেলায়। ব্যাণ্ডেল আসতেই বাজল নটা। কাগজওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল। একখানা বাংলা কাগজ কিনলাম। ভাঁজ খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের নামটা চোখে পড়তে থেমে যেতে হল। পড়ে দেখলাম, কাল রাতে আমার মৃত্যু হয়েছে। চশমাটা বেশ করে মুছে নিয়ে আর একবার পড়লাম। নাঃ, ভুল করি নি। নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'হাটখোলা-নিবাসী বিখ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রীগোলোকচন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে মথুরা এক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা আসিতেছিলেন। পথি-মধ্যে ট্রেন হইতে পড়িয়া

তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক।'

বর্ণনা নিভুর্ল। আমারি নাম গোলোক সান্যাল। নিবাসও হাটখোলা। বস্ত্র-ব্যবসায়ে কিছুদিন হল "বিখ্যাত" হয়েছি, সে কথাও ঠিক। যে রাস্তা ধরে বিখ্যাত হয়েছি সেটা ঠিক 'সাদা' রাস্তা নয়। সেই জন্যই বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় আমার আত্মার সদ্গতি কামনা করেছেন।

প্রথমটা বেশ মজা লাগল। মন্দ কি? নিজের মৃত্যু-সংবাদ নিজেই পড়ছি। সে-সুযোগ কজন পায়? হঠাৎ গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো? রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কে জানে তখন যদি দেহান্তর হয়ে গিয়ে থাকে? এই যে আমি শ্রীগোলোক সান্যাল, মথুরা এক্সপ্রেসের একখানা ক্লাশ টু কামরায় বসে কাগজ পড়ছি, এ হয়তো ঠিক কালকের "আমি" নই। নাড়ি দেখলাম; ঠিক আছে। নিঃশ্বাস? তাও বইছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম, রীতিমত লাগছে। গাড়িতে রোদ এসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, ছায়াও পড়ছে। তবে?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?

বসে পড়ে বললাম, না, না। ও কিছু না।

অন্য লোককে কেমন করে বলি যে আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই খবর? মনে পড়ল, অনেক দিন

আগে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। কে এক যাদব চক্রবর্তী ; বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল, তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বলে,—আরে এই তো আমি বেঁচে আছি,—কেউ স্বীকার করে না। আমার কি সেই দশা হল? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই! এই সেদিনও পাড়ায় শখের থিয়েটারে ২০০৲ দিয়েছি। গিন্নীর হাতে ভারী আর্মলেট। হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা খোলের দাম বলে নিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা। নাঃ, আমি দ্বিতীয় যাদব চক্রবর্তী হতে রাজী নই। এ-সব এই কাগজওয়ালার ধাপ্পা। নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আমার নাম গোলোক সান্যাল।

হাওড়ায় পৌঁছে বাড়ি যাওয়া আর হল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ছুটলাম সেই কাগজওয়ালার অফিসে।

একটা প্রকাণ্ড টেবিল। পুরোনো বনাতে মোড়া। জায়গায় জায়গায় কালির দাগ। মাঝে মাঝে ছেঁড়া। একরাশ কাগজপত্তর ছড়ানো তার ওপর। একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক একমনে লিখে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। আমার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, বসুন। বলেই আবার ডুবে গেলেন লেখার মধ্যে। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললাম, আপনিই কি সম্পাদক?

—সহকারী সম্পাদক।

—আপনাদের আসল ব্যবসাটা কি বলুন তো?

এবার তিনি চোখ তুললেন। কাগজখানা তাঁর সামনে

ফেলে দিয়ে বললাম, এ সব কী হচ্ছে ? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়ে কি কাজ হাঁসিল করতে চান ?

সহকারী সম্পাদকের নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে হাঁ-টা বড় হয়ে গেল। পুরু চশমার আড়ালে চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। মুচকি হেসে মিহি গলায় বললেন, দেখুন, প্রথমত আপনিই যে গোলোক সান্যাল সে-কথা এখনো প্রমাণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে আমাদের সংবাদ-দাতা এ খবরটা কোত্থেকে পেয়েছেন। তৃতীয়ত—

বাধা দিয়ে বললাম ; থাক, আর তৃতীয়তে দরকার নেই ! এই নিজস্ব সংবাদ-দাতার ঠিকানাটা দিন। বোঝাপড়া ঐখানেই করে নেবো।

সহকারী মহাশয় গলাটা আরো মিহি করে বললেন, আজ্ঞে, সংবাদ-দাতার নামঠিকানা আমরা প্রকাশ করতে পারি না।

—কেন ?

—ওটা সাংবাদিক রীতি নয়।

—তার মানে, ঐ সব সংবাদ-দাতা-টাতা সব ভুয়ো। আজগুবি খবরগুলো বুঝি এই বনাত-ছেঁড়া টেবিলে বসেই তৈরি হয় ?

কোনো জবাব এল না। কাগজ তুলে নিয়ে বললাম, এই দামী খবরটা কোত্থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটুকু বলবেন কি ?

—ঐ কাগজে যেটুকু আছে, ওর বেশী আমার কিছু বলবার নেই। কাগজটা খুলে দেখলাম খবর এসেছে ধানবাদ থেকে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল আসলে দেখলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন। ধানবাদের মত জায়গায় খবর-কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দা-বিভাগের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন কিছু একটা না করে ফিরেই বা যাই কি করে? একদিন এ-পাড়া একদিন ও-পাড়া ধরনা দেওয়া শুরু করলাম। বাংলা কাগজ-খানার নামই কেউ জানে না, তার সংবাদদাতার খোঁজ দেওয়া



তো দূরের কথা। একটা উড়ো খবর পেয়ে বাইরেও ঘুরে এলাম দিন দুই। এমনি করে কেটে গেল ছ-সাত দিন। শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে এসেছে। ফিরে যাব মনে

করেই শেষটায় ইস্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে আড্ডা নিয়েছি। দেখলাম একজন খদ্দর-ধারী চশমা-পরা ছোকরা রোজ কলকাতার খবর-কাগজগুলো বুঝে নিতে আসে। গাড়ি আসতেই চেপে ধরলাম তাকে।

—আপনিই কি অমুক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা ?

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক তাকিয়ে নিয়ে বলল, কেন বলুন তো ?

বুঝলাম, নরম রাস্তা ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, বিদেশী লোক। বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনিই তা হলে—

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার রিপোর্টার। বলুন কি করতে হবে আমাকে ?

—ওঃ, বাঁচালেন, মশাই। এই খবরটা দেখুন! এই গোলোক সান্যাল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ইনি কি করে মারা গেলেন, দেহটারই বা কি ব্যবস্থা হল ? অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা—বিশেষ করে ওঁর বাড়ির সবাই।

ভদ্রলোক বললেন, সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না। রেল পুলিশে খবর নিন। মৃতদেহ এখানেই আনা হয়েছিল। ময়না তদন্তও হয়েছে, এই পর্যন্ত জানি। নামধাম সব ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

পরদিন রেল-পুলিশের আফিসে হানা দিলাম। দারোগা বাবু মন দিয়ে আমার সমস্ত কথা শুনে গেলেন, এবং একটা

গোটা সিগারেট শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং আপনার এ খবরে কী দরকার?

—আমি গোলোক সান্যালের নিকট আত্মীয়; এবং সেইজন্যেই এ খবরে আমার বিশেষ দরকার।

—কিন্তু আমরা তো সেই দিনই তার বাড়ির ঠিকানায় তার করে সব জানিয়ে দিয়েছি।

নিজের অগোচরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কি বললেন? বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছেন?

—তা ছাড়া আর কি করা যেত বলুন? কোন অন্যায় হয়েছে কিছু?

—শুধু অন্যায়? সর্বনাশ! চরম সর্বনাশ করেছেন আপনি।

দারোগার চোখে-মুখে ঘোর সন্দেহের ছায়া পড়ল। আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি?

নাম মুখে এসে গিয়েছিল; সামলে নিলাম। সত্যি পরিচয় দিয়ে লাভ হত না। বিশ্বাস করবে না। বললাম, নাম দিয়ে আর কি হবে আপনার?

—জানতে ইচ্ছে হয় বৈকি একটু। নতুন আলাপ হল।

হঠাৎ যা মনে এল বলে ফেললাম,—আমার নাম গোবিন্দলাল সামন্ত।

দারোগা বাবু হেসে বললেন, দেখুন, বাবুসাব, আমরা পুলিশের লোক, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। কিন্তু যতটা কম আপনারা

মনে করেন, ঠিক ততটা নয়। সান্যালের আত্মীয় হতে হলে আর যাই হোক, সামন্ত হওয়া চলে না। নামটা বদলে দিন। নইলে অনেক ফ্যাসাদ। জানেন তো পুলিশের লোক আমরা।

এর পরে আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না। বললাম, তা জানি বৈকি? আপনাদের বিদ্যার কি আর অন্ত আছে? একটা জ্যান্ত মানুষকে মড়া বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি, মরার খবরটা বেশ ঘটা করে তার বাড়িতে জানিয়েও বসে আছেন।

দারোগা বাবু এবার চটলেন। রুক্ষ ভাবে বললেন, এ সব আপনি কি বলছেন?

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলছি। আমার আসল নামটা শুনলে বিশ্বাস করবেন? যে লোকটাকে নিয়ে আপনারা এত কাণ্ড করছেন, আমিই সেই গোলোক সান্যাল।

চলে যাচ্ছিলাম। দারোগা বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায়? উহুঁঃ। এটা মোটেই সাধারণ অ্যাক্‌সিডেণ্ট নয়। এর মধ্যে রহস্য আছে। বলে এক হাঁক দিলেন, এই, কৌন্ হ্যায়? একজন সিপাই ছুটে এল। দারোগা হুকুম দিলেন, উনকো হাজতমে লে যাও।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। কিছু মনে করবেন না। কাল আবার দেখা হবে। নমস্কার।

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। না হয় ছেপেছিল একটা মৃত্যুসংবাদ। সত্যি সত্যিই তো আর মরি নি! শুধু কাগজে কলমে মরা। কোনো ক্ষতি ছিল না। আর এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দুরাত ধরে ছারপোকা আর মশা মিলে যে রকম রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত-ঘর থেকে যে জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব, এমন ভরসা নেই। দুটো দিন পেটে কিছু পড়ে নি। দারোগা বাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেন নি, ত্রুটি আমারই; সেটা মুখে তুলতে পারি নি। ছেঁড়া কম্বলের ওপরে এক রকম অসাড় হয়ে পড়ে ছিলাম। একটি পুলিশ এসে বলল আমাকে এবার জেলে যেতে হবে। যেখানে হোক যাবার জন্যে মনটা অত্যন্ত ছটফট করছিল। বললাম, বেশ চল। জেলেই চল।

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি। তারই একটা দিক পুলিশের হাতে। সবাই তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত দেখিয়ে হাসছে। দুধার থেকে কানে আসছে চোট্টা হ্যায়—নামকরা পকেট-মার—কি রকম ডাকাত দেখেছ?

চোখে জল এসে পড়ল খানিকটা। পাশ দিয়ে একখানা গাড়ি চলে যাচ্ছিল। যে লোকটি ভিতরে বসে—মনে হল যেন চেনা মুখ। সেও ঝুঁকে পড়ে দেখল। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তার চোখ এড়ানো গেল না।

—এই, রোখো, রোখো—

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন—ধানবাদের কয়লা-খনির মালিক বংশীপ্রসাদ, আমার অনেক

দিনের পুরোনো বন্ধু। চোখের জল এবারে আর বাধা মানল না, অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

—বেপার কি সানিয়েল বাবু ?

ব্যাপার বলবার মত অবস্থা তখন আমার নয়।

বংশীপ্রসাদের গাড়িতে থানায় ফিরে এলাম এবং খানিকটা সামলে নিয়ে মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বললাম। বংশী গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সেই দারোগাটি ছুটতে ছুটতে এলেন। একগাল হেসে, একরাশ ক্ষমা চেয়ে এবং একবোঝা বিনয় দেখিয়ে, এমন আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কখন এর হাত থেকে রেহাই পাব। রেহাই পেতে অবিশ্যি দেরি হল না। বংশীর গাড়িতে যেতে হল তার বাড়ি, সেখান থেকে কিছু মুখে দিয়েই সোজা ইস্টেশনে।

তীর-বেগে ট্যাক্সি ছুটছে। বাড়ির কাছে এসে কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই। মনটা বিষিয়ে উঠল। স্ফূর্তি করবার আর সময় পেলেন না বাবাজিরা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

গেটে গাড়ি থামল। এ কি! এত লোকজন কিসের? দুধারে কলাগাছ। আগা-গোড়া গেটটা ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। বাড়ি ভুল করি নি তো ? নাঃ। ভেতরে ঢুকে

যা দেখলাম, একেবারে চক্ষুস্থির। সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি জুড়ে জমকালো চাঁদোয়া খাটানো। তার নীচে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। মেহগিনির খাট, তার ওপরে দামী বিছানা, চৌকি, আসন, বোঝা বোঝা বাসনপত্তর, —রুপোর সেট, কাঁসার সেট—ছাতা, জুতো, কার্পেট, সতরঞ্চি, আরো কত কি! হঠাৎ চোখে পড়ল তারি মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান্—মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে পুরোহিত। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না যে এটা হচ্ছে শ্রাদ্ধবাসর। শ্রাদ্ধ হচ্ছে আমারই! ছেলেরা বেশ ঘটা করেই করছে, যেমনটা ঠিক হয়ে থাকে অন্য পাঁচজন বড়লোকের বেলায়।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পুরোহিত তার হাতে এক কুশী জল দিয়ে বললেন, ভীত হয়ো না বৎস! নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার প্রেতাত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল সিঞ্চন কর। বল, স্নাত্বা পিত্বা সুখী ভব।

হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেতাত্মা! লাথির পর লাথি মেরে সব একাকার করে দিলাম। প্রেতাত্মা! হটাও সব। চারদিকে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল অত বড় শ্রাদ্ধবাসর।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলাম—সে আর এক কাণ্ড। হল্ ঘরের মেঝের উপর গিন্নী পড়ে আছেন। পরনে শাদা থান

গয়না নেই, পুরোপুরি বিধবার বেশ। দু-তিন জনে মাথায় জল ঢালছে। জ্ঞান নেই।

এমন সময় খবর এল পুলিশের কোন সাহেব এসেছেন দেখা করতে। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়।

—কি চাই, বলুন ?

—আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর বেরিয়েছিল সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সব কাগজে প্রতিবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—সে তো দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

পুলিশ-সাহেব একখানা নাম-ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, এটা আপনার কার্ড ?

—হ্যাঁ, আমারি কার্ড। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন ?

—২২ তারিখে ডাউন মথুরা এক্স্‌প্রেস থেকে নামতে গিয়ে একজন লোক হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মনিব্যাগে নাম-ঠিকানা-লেখা এই কার্ডখানা ছিল।

—ওঃ! সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক! এলাহাবাদে তার সঙ্গে আলাপ। আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। একখানা কার্ড দিলাম। মনিব্যাগেই যেন রাখল মনে হচ্ছে। আহা! লোকটি মারা গেছে।

—আজ্ঞে হাঁ।

—তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন ?

পুলিশ সাহেব কথা বললেন না। জিজ্ঞেস করলাম, ভুলটা ধরা পড়ল কি করে ?

—ময়না তদন্তে ডাক্তারের সন্দেহ হল, মৃত ব্যক্তি বোধ হয় মারোয়াড়ী। আরো তদন্ত চলল। তারপর ধানবাদ থানায়—

—তার সাক্ষী তো আমি নিজেই। কিন্তু এই ভুলটা আগে জানতে পারলে নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না। আর এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধও এড়ানো যেত।



একটি "করুণ গল্প"

কানাঘুষা শোনা গেল—কবি প্রভঞ্জন তরফদার নাকি আর লিখছেন না। সম্পাদকের দল চঞ্চল হয়ে উঠল। সামনেই পুজো। বিশেষ সংখ্যার তোড়জোড় চলছে। প্রথম পাতায় কবি প্রভঞ্জনের একটা জমকালো কবিতা না থাকলে যে বাজারই মাটি। ছুটলাম বিষ্টুনগরে। না, যা ভয় করছিলাম, তা তো নয়। কবি বেশ সুস্থই আছেন। আমার সামনেই এল তাঁর বৈকালিক জলখাবার—বেশ বড় একডিশ ফজলি আম, আর তার পাশে পুরো আধসের সন্দেশ। সঙ্গে এল এক ঝাঁক রাক্ষুসে মাছি। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। হ্যাঁ, যুদ্ধ বৈ কি!—ফজলি আমের অধিকার নিয়ে মানুষে আর মাছিতে যুদ্ধ। সমানে দুহাত চালিয়ে মানুষ জয়ী হলেন বটে, কিন্তু পাঁচ মিনিটেই তাঁকে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হল।

একগ্লাস জল খেয়ে একটু দম নিয়ে তরফদার বললেন তোমার জন্যে একটু চা-টা—

হাতজোড় করে বললাম, মাপ করবেন। ক্ষিধে একেবারে নেই।

কবি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। হাতটা ধুয়ে নিয়ে বললেন, এরি নাম বিষ্টুনগর। সন্ধ্যার পরে যদি থাক, একটা মজার ম্যাজিক দেখতে পাবে।

—ম্যাজিক!

—ম্যাজিক বৈ কি? তোমার রং বদলে যাবে। আছ টুকটুকে ফরসা; হয়ে যাবে আমার এই মানকের মত ভ্রমরকৃষ্ণ।

ভয়ে ভয়ে বললাম, কি রকম?

—বুঝতে পারছ না? মশা, মশা! বেমালুম ঢাকা পড়ে যাবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি চমৎকার মশার প্লাস্টার।

কবি হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সন্ধ্যা হতে আর ঘণ্টা দেড়েক দেরি। আসল কথা পাড়লাম, তা হলে লেখাটা কবে দিচ্ছেন, স্যর? পূজা-বার্ষিকীর দু-তিন ফর্মা ছাপা হয়ে গেল।

কবি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, লেখা? না, ও সব চুকে গেছে। লেখা চেয়ো না আমার কাছ থেকে।

কথাটা এমন করুণ শোনাল যে, আমার মুখেও হঠাৎ কোন জবাব এল না। কিছুক্ষণ পরে বললাম, নাঃ এ কিছুতেই

হতে পারে না। কাব্য-জগৎ থেকে এমনি হঠাৎ আপনি সরে দাঁড়াবেন, এ আমরা সইব না। লিখতে আপনাকে হবেই।

তরফদার মাথা নেড়ে বললেন, সে হয় না। কলম আর ধরা চলবে না।

অত সহজে হাল ছেড়ে দিলে সম্পাদকগিরি করা চলে না। কবিকে চেপে ধরলাম—কী এমন ঘটল যার জন্যে এমন অসময়ে তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

তরফদার অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। তারপর হাসলেন—বলতেই হবে ? আচ্ছা, তবে শোনো।

উঠে গিয়ে ভিতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে কবি শুরু করলেন—

বদলি হয়ে এলাম বিষ্টুনগর। মনে হল বেঁচে গেলাম। তোমাদের মত কাগজওয়ালাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বেশ আরাম করে ঘুমোনো যাবে দুদিন। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এ দেশেও দেখলাম সম্পাদক আছেন। কদিন যেতেই পেছনে লাগলেন একজন। বললাম, কি আপনার কাগজের নাম ?

—হুঙ্কার।

—সর্বনাশ! আপনি অন্য লোক দেখুন। নেহাত নিরীহ মানুষ আমি। জীবনে কোনো দিন চেঁচিয়ে কথা বলিনি। হুঙ্কার ছাড়তে পারব না।

সম্পাদক মশাই তাঁর দাড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?

নামটা ঐ একটু জমকালো বটে ; কিন্তু আসলে ছাপি আমরা সবই—চুটকি, চাটনি যা পাই।

—আমাকে কি দিতে হবে ?—চুটকি না চাটনি ?

—না, ওসব নয়। আপনার কাছে একটি গল্প চাই—বেশ প্রাণখোলা হাসির গল্প।

শুনে দুঃখই হল। Ah ! What a fall—'হুঙ্কার' চায় প্রাণখোলা হাসির গল্প

তোমাদের পাল্লায় পড়ে কবিতা-টবিতা দু-চারটা লিখেছি বটে, কিন্তু গল্প তো কখনো আসে না—তাও আবার হাসির গল্প ! কিন্তু উপায় কি ? সম্পাদক একেবারে পেয়ে বসলেন। অগত্যা ভাবতে শুরু করলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবি, বেড়াতে বেড়াতে ভাবি, শুয়ে শুয়ে ভাবি। কিছুই ছাই মাথায় আসে না। হাসির গল্প ভেবে আমার অবস্থা হয়ে উঠল রীতিমত করুণ।

তারপর মনে মনে যা হোক একটা কাঠামো খাড়া করে একদিন দুপুরবেলা বসলাম তোড়জোড় করে। বাঁ হাতে পাখা—মাছি তাড়াবার জন্যে। ডান হাতে কলম। দু-চার লাইন সবে এগিয়েছি, এই রাস্তার দিকের ভেজানো দরজাটা হঠাৎ দুমদাম করে খুলে গেল। দেয়াল থেকে খসে পড়ল এক চাপড়া চুন-বালি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল, ডাকাত নয়, আমাদের স্বামীজি। স্বামী বজ্রানন্দ। গায়ে গেরুয়া রঙের আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, হাতে মোটা লাঠি।

দুকাপ চা আনতে বলুন, আর কিছু খাবার—বলে তিনি তোমার ঐ চেয়ারটাতে বসলেন। মচমচ করে উঠল বেচারা। নেহাত কাঠের শরীর, তাই টিকে গেল। তবে অন্তত দুমাসের পরমায়ু ঝরে গেল ঐ এক ধাক্কায়।

—কি লিখেছেন ওটা ?—বজ্রানন্দ হাঁক দিলেন।

—ও কিছু না ; একটা গল্প।

—কিসের গল্প ?

—এই একটা হাসির গল্প।

—'হাসি' !—গর্জে উঠলেন স্বামীজি,—হাসির দিন কি এখনো শেষ হয়নি ? এই দেশজোড়া দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অবিচার, অত্যাচার—এসব দেখেও কি আপনাদের হাসির স্রোত রুদ্ধ হয়নি ? আর হাসি নয়, প্রভঞ্জনবাবু ! কান্নার দিন এসেছে বাঙালীর। কাঁদুন, প্রাণ ভরে কাঁদুন ; যদি দেশকে বাঁচাতে চান, বদলে দিন আপনার সাহিত্যের সুর। রসসৃষ্টি যদি করতে চান, করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু একটি মাত্র রস আছে আজ বাংলায়,—সেটা হচ্ছে করুণ রস !

ঝড়ের মত ছুটে চলল বজ্রানন্দের বক্তৃতা। তারি মাঝখানে ঝড়ের মতই উড়ে গেল একথালা খাবার আর দু-পেয়ালা চা। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের মত। যাবার আগে শুধু লাঠিটা ঠুকলেন একবার। কেঁপে উঠল কংক্রীটের মেঝে।

স্বামীজি কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিটাই বদলে দিয়ে

গেলেন। ঠিকই তো! দেশজোড়া হাহাকার। দাঁত বার করে হাসি কোন লজ্জায়? ছিঁড়ে ফেলে দিলাম হাসির নকশা। চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলাম তরল থেকে জমাট করুণ রসের দিকে। করুণ গল্প চাই একটা।

মোটা সিগারের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে তন্ময় হয়ে ভাবছি গল্পের প্লট। বেশ ঝিমিয়ে এসেছে মনটা।

—বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?—

চমকে উঠলাম। ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটা অচেনা লোক। অত্যন্ত রোগা। পরনে ময়লা কাপড় আর তালি-দেওয়া কোট। বিরক্তির সুরে বললাম, কে তুমি?

—আজ্ঞে, আমি টিকাদার।

—এখানে কি চাই?

—কিছু চাই না। টিকা দিতে এসেছি। বলে সে তার যন্ত্রপাতি বের করল।

—না, না। টিকা নেবার সময় নেই আমার। অন্য সময় —আরেক দিন এস।

লোকটা মিনতির সুরে বলল, জানেন তো, স্যর, সারা শহর ঘুরতে হয় আমায়। এ পাড়ায় এসেছিলাম। সব বাড়িই প্রায় সেরে এসেছি। যদি দয়া করে নিয়ে নিতেন—বেশী সময় নেব না—

—বড্ড জ্বালাতে শুরু করলে দেখছি। বলছি, সময় হবে না আজ। তবু ঘ্যান-ঘ্যান করছ?

টিকাদার মুখখানা শুকনো করে তার যন্তরপাতি গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হল, লোকটার চেহারা, চলবার ধরন, মুখের ভাবটা—সবই যেন বড্ড করুণ। ঠিক হয়েছে। ঐ আমার গল্পের নায়ক। ওরই ওপরে কল্পনার তুলি বুলিয়ে গড়ে তুলব করুণ গল্প। গল্পের নাম দিলাম—"টিকাদার"।

গল্প শুরু হল —

গরিব টিকাদার। নাম ব্যোমকেশ। সামান্য মাইনে। এই তুর্দিনে তুবেলা তুমুঠো অন্ন জোটে না বেচারীর। গায়ে নেই মাংস। মনে নেই বল। রোদে, জলে দিনের পর দিন খেটে মরে সারা বছর। না আছে ছুটি, না আছে অবসর। শহরে যখন মহামারী লাগে, ব্যোমকেশ তখন ভুলে যায় বিশ্রাম, ভুলে যায় স্নানাহার। ঘরে ঘরে দেখা দেয় তার ছোট্ট ছুরিখানা নিয়ে। হাসি মুখে হাতে হাতে ঢেলে দেয় ছোট্ট টিউব থেকে তার মহৌষধি। মানুষকে মহাব্যাধির হাত থেকে মুক্তি দেবার ব্রত নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু হায়, তার এই মহাদানের মূল্য কেউ বোঝে না। তার উপরে নেই কারো স্নেহ, নেই এতটুকু সহানুভূতি। একটু ভদ্র ব্যবহার, একটি মিষ্টি কথাও জোটে না তার কপালে।

এমনি করে এগিয়ে চলল গল্প। মাঝে মাঝে তু-চার লাইন কবিতাও দিলাম ঢুকিয়ে —

ব্যোমকেশ টিকাদার,
টাক মাথা, কুঁজো, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দেহ কঙ্কালসার।

চৈত্র দুপুরে ঘরে ঘরে সবে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ;
ব্যোমকেশ ছোটে এ-পাড়া ও-পাড়া—শিরে ছাতি ভগ্ন।
গিন্নীরা বলে, 'এ কোন আপদ ?'
ছেলেগুলো হাঁকে— 'ভাগো'।
ব্যোমকেশ হেসে বের করে ছুরি—
'দেখি হাতখানা, মাগো'॥

সবার ঘরের সঙ্গে ব্যোমকেশের যোগ। কিন্তু নিজের ঘরের খবর রাখবার তার সময় নেই। সংসারে রুগ্না স্ত্রী—সারা বছর ভোগে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে। তাই নিয়ে খাটে সারাদিন। পরনে ছেঁড়া কাপড়। কোনো দিন জানে না কাকে বলে আরাম বা আনন্দ। একটিমাত্র ছেলে। সারাক্ষণ কাঁদছে। পেটে পিলে, গলায় মাদুলি। বৌ কোনো দিন বলে, ওগো, শুনছ ? ছেলেটা এত ভুগছে, একজন ভাল ডাক্তার দেখাও। খেঁকিয়ে ওঠে টিকাদার—টাকাটা কি আকাশ থেকে পড়বে ? বৌ তর্ক করে—তাই বলে বাছা আমার বিনি-চিকিচ্ছেয় মারা যাবে ? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা। ব্যোমকেশ আর কথা বলে না। হুঁকায় কয়েকটা জোর টান দিয়ে ছুরি আর ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

এমনি করে চলে বছরের পর বছর। তারপর এল ভীষণ মহামারী। ঘরে ঘরে দেখা দিল করাল বসন্ত। ব্যোমকেশের খাটুনি বেড়ে গেল দশগুণ। ব্যাধি আর বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীর। ভাঙা হাড়গুলো কোনো রকমে বয়ে দ্বিগুণ

উৎসাহে টিকা দেয় বাড়ি বাড়ি। সবারই চোখে মুখে আতঙ্ক। ব্যোমকেশ তাদের সাহস দেয়, দেয় সান্ত্বনা।

বৌ বললে, শহরসুদ্ধ লোককে তো টিকে দিচ্ছ। বাড়ির দিকে একবার চাইতে নেই? আমার কথা বলছি না। এ পোড়া প্রাণ গেলেই বাঁচি। কিন্তু ছেলেটাকে একটা খোঁচা দিতে হবে তো? পাশের বাড়িতে যে তিনজনের হয়েছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ চমকে উঠল—তাই নাকি? আচ্ছা, স্কুল থেকে আসুক খোকা। দিয়ে দেবখন ওবেলা।

ওবেলা আর দেওয়া হল না। ছেলে ফিরল, গায়ে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। রাতারাতি সমস্ত শরীরে ছেয়ে গেল বসন্তের গুটি। টিকাদারের মুখে নামল চিন্তার ছায়া। ধরনটা বড় মারাত্মক। টেকানো কঠিন হবে। বৌ লুটিয়ে কেঁদে পড়ল—ওগো, এ কি হল গো? ব্যোমকেশ ফিস-ফিস করে বলল, চুপ, চুপ! জানো না, বাড়িতে বসন্ত হলে অফিস যাওয়া বারণ? আর না বেরোলেও মাইনে পাব না। বুড়ো বয়সে চাকরিটাও যাবে। চেপে যাও। ভগবানকে ডাকো। কান্নার সময় নেই আমাদের।

এর পরের অংশটা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি কোমল। সাত দিনের দিন ব্যোমকেশ হারাল তার একমাত্র ছেলে।

মায়ের চোখে জল নেই। কথা বলে না; ডাকলেও সাড়া দেয় না। যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। মাঝে মাঝে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ব্যোমকেশ তেমনি আছে। তেমনি ছুটছে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া—রোদে, বৃষ্টিতে, শীতে ও বর্ষায়। ছেলেপিলে দেখতে পেলেই ডাকে, বলে—চট করে টিকাটা

নিয়ে নাও তো বাপধন! কিচ্ছু লাগবে না, ঠিক একটি পিঁপড়ের কামড়—

গল্প শেষ হল। পড়ে, নিজের চোখেই জল এসে গেল। গেলাম পাশের ঘরে। গিন্নী শুয়ে ছিলেন; হাতে একখানা ডিটেকটিভের বই। বললাম শোনো দিকিন, কেমন হল গল্পটা।

তিনি রেগে উঠলেন—রক্ষে কর, বাপু, তোমার ঐ সব নাকে-কান্না ভালো লাগে না আমার।

—আহা! শোনোই না একবার। তারপর না হয় বোলো যা খুশি—

মিনিট পাঁচেক পড়বার পরেই তাঁর নাক ডাকা শুরু হল। আশা হল—গল্পটা তাহলে উতরেছে। শরৎ চাটুজ্জে, বিভূতি বাড়ুজ্জের করুণ গল্পগুলো শুনতে শুনতেও এমনি নাক ডাকে আমার গৃহিণীর। দিলাম পাঠিয়ে। সম্পাদক খুশি হলেন। ছেপে দিলেন 'হুঙ্কারের' প্রথম পাতায়।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা এই ঘরে এই চেয়ারটিতে বসে কি একটা বই পড়ছিলাম। ঝড়ের মত ঢুকল সেই টিকাদার। একখানা 'হুঙ্কার' আমার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, এটা আপনার লেখা?

দেখে বললাম, হ্যাঁ।

টিকাদার তেড়ে উঠল, কেন লিখেছেন এসব মিথ্যে কথা? কে বলেছে আপনাকে যে আমার ছেলে মারা গেছে বসন্তে?

তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে বললাম, আ-হা! আমি তো তোমার কথা লিখিনি। ও একটা গল্প।

টিকাদার ভেংচে বলল—গল্প ? ব্যোমকেশ টিকাদার দু-দশটা রয়েছে বিষ্টুনগরে, না ?



—তোমার নাম কি ব্যোমকেশ ?

—না, ব্যোমকেশ হবে কেন ? আপনার জন্যে আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নামটাও দেখছি বদলে দিতে হবে ?

—কি সর্বনাশ ! বিশ্বাস কর, টিকাদার, আমি সত্যিই জানতাম না যে তোমার নাম ব্যোমকেশ। ওটা একেবারেই আন্দাজে দেওয়া।

ব্যোমকেশ মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল, যার মানে হচ্ছে, আমার কৈফিয়ত সে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। শুধু ব্যোমকেশ একা নয়, তাকিয়ে দেখলাম আরো জন চারেক ষণ্ডা মতন

ছেলে ঐ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম, তোমাদের কি চাই?

একজন এগিয়ে এসে আস্তিন গুটিয়ে বলল, ক্ষতিপূরণ চাই। আপনার ঐ লেখার জন্যে আমাদের বাবার চাকরি গেছে।

—চাকরি গেছে! কেন?

উত্তরে ছেলেগুলো যা বললে, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। মাস দুই আগে ওদের এক ভাই আমাশায় ভুগে মারা যায়। ঘটনাটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জানতে পারেন, এবং আমার গল্পটাও কেমন করে তাঁর নজরে পড়ে। তিনি ব্যোমকেশকে ডাকিয়ে বলেন, ওসব বাজে কথা। কাগজে বেরিয়েছে তোমার ছেলে মারা গেছে বসন্তে।···ভদ্রলোক আগে থাকতেই কোনো কারণে রেগে ছিলেন, ওর কোনো কৈফিয়তই শুনলেন না। বসন্তের খবর লুকিয়ে রেখে অফিস করেছে বলে চাকরিটি নিয়ে নিলেন।

টিকাদার মুখ বেঁকিয়ে বলল, কেন, আপনি কি লেখেননি যে চাকরি যাবার ভয়ে ছেলের বসন্ত চেপে গেছি? এখন যে বড্ড গ্যাকা সাজছেন?

কি যে বলব ভেবে পেলাম না। ব্যোমকেশের দল শাসিয়ে গেল, তারা নালিশ করবে। করলও তাই। যেতে হল কোর্টে। হাকিমকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমি যা লিখেছি সেটা নিছক গল্প; খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়। আমি কবি, রিপোর্টার বা সাংবাদিক নই।···ফল হল না। তিনি

একটু বিদ্রূপ করে বললেন, কিন্তু আপনার কাছে যেটা কাব্য, ওর পক্ষে যে সেটা মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল। চাকরিটি তো আর কবির কল্পনা নয়।

দুহাজার টাকা ক্ষতিপূরণের হুকুম হল। বন্ধুরা বললেন, এ জুলুম। তুমি আপীল কর। আমি বললাম, না, কোর্টে আর নয়। কিন্তু কোথায় পাই দুহাজার টাকা? শেষ পর্যন্ত গিন্নীর গয়নায় টান পড়ল। তিনি চুপ করে রইলেন। বুঝলাম এটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

দিন চারেক পরে অফিস থেকে ফিরে দেখলাম, উঠোনে একগাদা কাগজপত্তর পুড়ছে। গিন্নী গালে হাত দিয়ে পাশে বসে আছেন। বললাম, ওসব কি পোড়াচ্ছ?

কোনো উত্তর পেলাম না। কেমন একটু সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দেখলাম, আমার লিখবার টেবিলের সব দেরাজ খোলা। ভেতরটা একদম খালি! দুবছর ধরে একখানা কাব্য লিখছিলাম। আশা ছিল, বাংলা-সাহিত্যে আলোড়ন তুলবে আমার সেই গ্রন্থ। এ ছাড়াও ছিল অনেক ছোট বড় কবিতা—আমার যৌবনের স্বপ্ন, পরিণত বয়সের সৃষ্টি। সব শেষ হয়ে গেল ঐ উঠোনের কোণে। টেবিলের উপরে নজর পড়তেই দেখলাম একখানা কাগজ। গৃহিণীর হাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"আর যদি কোনো দিন ঐ সব ছাইপাঁশ লিখেছ দেখতে পাই, সেদিন আমি গলায় দড়ি দেব।"

কবি প্রভঞ্জন তরফদার তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। জ্ঞান ছিল না যে সন্ধ্যা কখন চলে গেছে। সর্বাঙ্গে মশার প্লাস্টার—তাও একেবারে খেয়াল হয়নি।

উঠলাম। পুজো-সংখ্যার লেখা আর চাওয়া হল না।

